রাজযোটক

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

চৈত্র ১৩৪৭

মূল্য—দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫২—২২.৩.৪১

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নাম বাংলা কথা-সাহিত্যে অপরিচিত নয়। নানা সাময়িক-পত্রে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত তাঁহার গল্পগুলি সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক সমাজে বিশেষ আদৃত হইলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় সাধারণ পাঠক সমাজে তিনি অপরিচিত রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলি পড়িয়া আমরাই বাঙালী পাঠক মহলে তাঁহাকে পরিচিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি।

গল্পগুলির রচনার ক্রম লিপিবদ্ধ নাই, তবে মোটামুটি সাময়িক-পত্রে প্রকাশের তারিখ হইতে কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।—

তিন জন—বিজলী, ১ম বর্ষ ৬ সংখ্যা, ১৩২৭

লেডিস ক্লাব—'বিজলী', ১ম বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১৩২৭

চার ধাম—'বিজলী', ১ম বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ১৩২৮

গঙ্গা ফড়িং—'উত্তরা', শ্রাবণ ১৩৩৭

স্ত্রীধন—'বিচিত্রা', ভাদ্র ১৩৩৭

মণি-কর্ণিকা—ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

মা—'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৩৮

অমর—'উত্তরা', অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

তেপান্তরের মাঠ—'জয়শ্রী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

দর ও দস্তুর—ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

সন্ন্যাসী—'দুন্দুভি' ১৩৩৯

রাজ যোটক—'ছোটগল্প', পৌষ ১৩৪০

ময়ূর-সিংহাসন—'ছোটগল্প', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১
আগাছা—'বঙ্গশ্রী', আশ্বিন ১৩৪১
জননী—উত্তরা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২
বিশুদ্ধ প্রেম—যুগান্তর, আশ্বিন ১৩৪৬

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচী

রাজযোটক

রাজযোটক

১

ব্যাপারটা কিছুই নয়, সরু চোঙে ভরা বুল্‌গেরিয়ার দধিবীজ মাত্র, এবং সেটা রাখা হয়েছিল ভাঁড়ারের তাকে, আর আনা হয়েছিল ডাক্তার অসিত চাটুয্যের একটিমাত্র ছেলের জন্যে, যেটিকে ডাক্তাররা বলে 'রিকেটি', মায়েরা বলে 'মুখ-চাওয়া' রোগা ছেলে, পাড়ার গিন্নীরা বলেন, 'পুঁয়ে পাওয়া' ছেলে।

ডাক্তারের ছেলে যে অমন হয় কেন, এ কথা ডাক্তারের বাড়ির লোকও ভাবে, পাড়ার লোকও ভাবে এবং বলে। সে হেতু-নির্ণয় এখন থাক।

ছেলে প্রায় তিন বছরের। বারো মাসের মধ্যে ছত্রিশ সপ্তাহ জ্বর থাকে, না থাকলে কাসি থাকে, তা না হ'লে সর্দ্দি, অথবা অজীর্ণ, নতুবা অকারণ কান্না—এ থাকেই। আর তার মা বলে, সেটা অসুখ। আসলে এই আড়াই বছরের আড়াই মাসও তাকে আর তার রোগকে পৃথক ক'রে দেখা যায় নি। যদি কোন দিন ভাল থেকেছে, 'শনি' 'মঙ্গল' 'নজর' 'দৃষ্টি' সমস্যার ভয়ে সেটা কেউ মুখে উচ্চারণ করে নি। অতএব সে রুগ্ন তো বটেই, তার ওপর নির্জীব ও নিরানন্দও।

বাপ বেচারা অনেক ভাবে, কিন্তু একমাত্র ডিস্পেন্সারির ওষুধ আনা ছাড়া তার ডাক্তারি আর কোন কাজেই লাগে না। তার বিদ্যা হার মেনে গেছে কি অজ্ঞাত কারণে, সে নিজেই বোঝে না। ফলে মাঝে মাঝে তারও ঐসব অলৌকিক 'নজর' 'মাদুলি'তে বিশ্বাস আসে যেন। এবারে ছেলের মা বললে, বাড়ির ডাক্তারের এলাকাড়ির চিকিৎসায় কি রোগ সারে? আমার মার মাসীমা বলেন, বদ্যিকে পয়সা না দিলে অসুখ সারে না।—কথার বাঁধুনিতে ওর বয়স যত মনে হয়, তত পৌরাণিক মোটেই নয়, মাত্র উনিশ বছর বয়স।

ডাক্তারের ডাক্তার-বন্ধু এল। এসে অবাক হ'ল, আশ্চর্য্য হ'ল এবং রাগ করলে। বললে, নাকে সর্ষের তেল দিয়ে এতদিন ঘুমোচ্ছিলে? ডাক্তার-বাপের ছেলে এমন বাদুড়ের মত হ'ল কি ক'রে? আরও অনেক কিছু যা বললে তা যথেষ্ট, আর যা না বললে তাও কম নয়।

চিকিৎসাপত্র লেখা হ'ল।

শিশি শিশি ওষুধ, বোতল বোতল ফুড, গায়ে মাখবার জন্য কড-মাছের তেল, আর তার সঙ্গে এল বুল্‌গেরিয়ার দধিবীজ, অর্থাৎ ভাষায় যাকে আমরা 'দম্বল' বলি।

তখন কিছুদিন দেশময় বুল্‌গেরিয়ার দধিবীজের নতুন খ্যাতি উঠছিল। মাসিকপত্রের পাতায় পাতায় ডাক্তারদের মুখে মুখে, খাদ্যতত্ত্বজ্ঞদের নির্দ্দেশে (এটা বর্ণাদ্যক্ষরিকা ভিটামিন যুগের আগের কথা), তার প্রচার ও পসারে রোগী এবং সুস্থ সকলেরই লক্ষ্য পড়ছে তার দিকে।

এতক্ষণ অবধি কোনও গোল ছিল না। গল্পে-শোনা হিন্দুস্থানী জননীর মত অনুপ্রভা ভেবে গর্ব্ব অনুভব করছিল, তার ছেলে চিররুগ্ন, বাড়িটি হাসপাতাল, এবং তার 'ইলাজমে এত্‌না রুপৈয়া লাগা,' অর্থাৎ প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছে চিকিৎসাতে। বিপত্তি হ'ল হঠাৎ। রাত্রে ঠাকুর

দই পেতে রেখেছিল চোঙ থেকে দম্বল নিয়ে অনুর শাশুড়ীর নির্দ্দেশমত। সকালে সে দই বেশ জ'মেও ছিল। ছেলে ভোরে খাবে হর্লিক্‌স, তারপর ঐ দইয়ের ঘোল, তারপর জীয়ানো মাছের ঝোল—পোরের ভাত সহ, তারপর আবার ঐ দইয়ে কাটানো ছানার জল ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনু পূজো ক'রে উঠল। চোখে পড়ল তাকের ওপর দইয়ের বাটি। বেশ জমেছে। অনুর মুখ প্রসন্ন। তারপর চোখে পড়ল দম্বলের চোঙটি। তার ওপরে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা—দই ও প্রস্তুতকারীর নাম ধাম ঠিকানা। অনু ইংরেজীতে চিঠিপত্রের ঠিকানা লিখতে ও পড়তে পারত। হঠাৎ কি মনে হ'ল।

খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাকের ওপরের জিনিসপত্র নামাতে লাগল।

সামনের দালানে আশ্বিনের হিম লাগবার ভয়ে পায়ে গরম মোজা জুতো, গায়ে ফ্লানেলের জামা, মাথায় পশমের টুপি পরা, ঝড়ের সময়ে কম্পিতশিখা প্রদীপের মতন ম্লানহাসিমুখ একটি ক্ষীণ শিশুকে কোলে নিয়ে ছেলের ঠাকুমা ব'সে ছিলেন ঘোল তৈরির আশায়। ঘোল তৈরি না ক'রেই বধূকে অন্য কাজে ব্যাপৃত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি গা বউমা? ইঁদুরে কিছু তুলেছে?

বধূ বললে, না, মা। বুল্‌গেরিয়ার দম্বল।

তাতে কি মা?—আশ্চর্য্য হয়ে শাশুড়ী বললেন।

ছিষ্টি বিলিতী অনাচার! ঠাকুর একেবারে তাকে তুলেছে।

শাশুড়ী চুপ ক'রে রইলেন। কথাটার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। আবার কেমন নতুনও মনে হতে লাগল। কিন্তু তর্ক ক'রে লাভ নেই, এবং আচারনিষ্ঠায় নিজেকে পুত্রবধূর চেয়ে খাটোই বা কি ক'রে করা যায়?

বেরুবার কাপড় প'রে অসিত ওপর থেকে নেমে এল। নিজের মাকে আর ছেলেকে দালানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এল। মৃদু হেসে ছেলের শীর্ণ রক্তহীন গালে টোকা মেরে জিজ্ঞাসা করলে, খেয়েছ কিছু?

ছেলে হাঁটতে না পারুক, কথা ভাল কয়। বললে, না, মা ঘর ধুচ্ছে।

অসিত আশ্চর্য্য হয়ে ভাঁড়ারের দিকে চাইলে, কেন? ওকে খেতে না দিয়ে ঘর ধোয়ার দরকার?

মার দিকে চাইলে।

মা চুপ ক'রে রইলেন।

দইটা জমেছে ভাল হয়ে?

মা বললেন, হ্যাঁ।

তা ওকে দিয়েছ?

মা বললেন, কি বিলিতী দম্বল এনেছিস, সব ছোঁয়া-লেপা হয়ে গেছে।

মানে?—ডাক্তার অবাক হয়ে রইল।

মা জবাব দিলেন না।

ঘরের ভেতর বধূ নির্লিপ্তভাবে ঝিকে নিয়ে কি সব ধোয়া-মোছা করছিল।

এবারে ডাক্তার মার দিকে চেয়ে বললে, পিসীমার চিঠিপত্র পাও?

মা বললেন, কেন?

একবার আসতে লেখ না। এলে সন্তুষ্ট হবেন। খোকার অমন বাদুড়ের বাচ্চার মত চেহারা শুধু আমিই দেখব? দাও, দইটা আমাকে দাও, আমিই করছি।

চাকর এসে বললে, বাইরে সতীশবাবু এসেছেন।

অমুর ধোয়া-মোছা হয়ে এল। ওদের মাছ-মাংস অখাদ্য-অনাচার,

আর অন্নুদের ঠাকুর-দেবতা বিধবা-বামুন আচার-বিচার,—অন্নু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনে কর, কেউ যদি ঐ দইয়ের পঞ্চামৃতে ঠাকুরকে স্নান করায়! অন্নু মনে মনে ভাবে, ঐ জন্যেই আর দেশে দেবতার দয়া নেই, তাই না খোকা অত ভোগে!

২

আগের ঘটনাটা হচ্ছে এই।—

অন্নুর বিয়েটা সবর্ণ আর যথারীতি শাস্ত্রলোকাচারাদিসম্মতই হয়েছিল। মেয়ে সবর্ণা ও গৌরবর্ণাও, এবং বাপের দিক থেকে উজ্জ্বলরজতবর্ণচ্ছটার অভাবও হয় নি।

বিয়ের আগে পিসীমা আর জ্যেঠীমা তাকে দেখে এসেছিলেন কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়ে। পিসীমা বললেন, খাসা সুন্দরী মেয়ে—ছোটটি। আর বাপ যা পয়সা করেছে কি বলব! আমাদের অসি যেমন ডাক্তার হয়ে বেরুচ্ছে, সেও তেমনই বড় ডাক্তার কিসের বুঝি। কলকাতার লোক পরেশ চক্রবর্ত্তীর নাম না জানে কে! তুমি একবার দেখ না, বউ, মেয়েটি। আমাকে মেয়ের মা আর পিসী যা ধরলে!

বলা বাহুল্য অসিতের জননীর উদ্দেশে এই কথাগুলি বলা হচ্ছিল।

অসিতের মা বললেন, তুমি যে বলছ ছোট্ট। সাজবে কি? আর তা হ'লে লেখাপড়াও কি জানে তেমন? অসির পছন্দ হবে তো?

ননদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, তুমি জানতে লেখাপড়া? আমার বিদ্বান ভাইয়ের যুগ্যি তুমি কত বড় 'বিদ্বান' ছিলে? ওর বাপ যদি চিরকাল তোমাকে নিয়ে ঘর করেছে, তার ছেলেও করবে।

এ যুক্তির জবাব মা দিতে পারেন নি। চুপ ক'রেই ছিলেন।

সেকালকার লোক বাপের ব্যবসা করত, এখনকার লোক শ্বশুরের ব্যবসায়ের উত্তরাধিকার পেতে পারে কি না ভাবে। যাই হোক, সব দিক ভেবে পিসীমা জ্যেঠীমা ঠাকুমা এবং মাতা ও পিতা সকলের সম্মতিতে অসিতের বিবাহের আয়োজন হতে লাগল।

মাসীমা বেড়াতে এসে বললেন, দিদি 'রাজচটক' নাকি মিল হয়েছে! গণক্কার দেখিয়েছেন তোমার শাশুড়ী। এমন মিল নাকি সেই রাম-সীতার হয়েছিল!

জ্যোতিষশাস্ত্রমতে রাজযোটক মিল হ'ল। গণ-বর্ণেও নাকি মিল চমৎকার। মেয়ে একেবারে শূদ্রবর্ণ। বর্ণশ্রেষ্ঠ মেয়ে! এ পর্য্যন্ত যাদের বিয়ে হয়েছে, দেখে এস গিয়ে (ঠাকুমা বলেন) তাদের দুর্গতি, তাদের নাম বলতে নেই!

অসিত শূদ্রবর্ণ শুনে কি একটা রসিকতা একবার করতে গিয়েছিল, ঠাকুমার পরিহাস ও ধমকে চুপ হয়ে গেল।

যথাকালে যথারীতি অনুপ্রভার অসিতের বিবাহ হয়ে গেল।

সেই ছোট বউ দিনে দিনে বিয়ের জল পেয়ে শশিকলার মত অথবা বর্ষায় কলাগাছের মত প্রবর্দ্ধিত হয়ে উঠল।

ঘরবসতে এল শ্বশুরবাড়ি। ভাঁড়ারের উনকুটি চৌষট্টি সব কাজ করে, পান সাজে। শুচিতা রক্ষা করে সর্ব্বাংশে।

খ্যাতির শেষ থাকে না।

তারপর ঠাকুমা যথাকালে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। পিসীমা প্রথমস্থানীয়ের প্রশংসাপত্র দিয়ে তীর্থবাসিনী হয়েছিলেন। মাসীমা

রাজযোটকের জোড় দেখতে আর আসতে সময় পান নি। অসিতের বাপও মারা গিয়েছিলেন।

বাড়িতে ছিলেন অসিতের মা আর তাঁর অন্য ছেলেমেয়েরা। আর অনু আর তার ঐ ছেলেটি। আর অনু আর তার শুচিতা।

অসিতের অনুকে মনে করলে আচার বাদ অনুকে মনে হয় না, আর আচার মনে করলে (অসিত অবশ্য জানে না আচার-তত্ত্ব), শুচিতা মনে করলে অনু ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই, ওর মনে হয়। এই অনু আর ছেলের কথা হচ্ছিল এবং পিসীমার।

মধ্যপথে সতীশ আসাতে অসিতের রাগটা হজম ক'রে নিতে হ'ল, এবং হাসিমুখে বাইরে যেতে হ'ল।

তারপর সহাস্যে চেয়ার টেনে বললে, বসবে? চা খাবে?

সতীশ বললে, না, বসব না। মেয়েটা সাত দিন একাজ্বরী হয়ে আছে। একবার দেখবি তুই?

ডাক্তারের গাড়ি বের করাই ছিল, সতীশের মেয়েকে দেখতেই আগে গেল। বছর দশেকের মেয়ে, জ্বর হয়েছে, রুগ্ন মনে হয় না, আচ্ছন্ন মোটেই না। সকালে জ্বর কম, বেশ সহজভাবে কথা কইলে।

মেয়ের মা পাশেই ব'সে ছিল, অপ্রস্তুতভাবে নমস্কার করলে।

ঘরে টিপয়ে ওষুধ-বিষুধ, টেবিলে প্রেস্কৃপ্‌শন-আদি, ছোট এক টুলে কুঁজো গেলাস, খাটের তলায় 'চিলিমৃচি'। খান দুই চেয়ার, একখানা ঈজি-চেয়ার, আর একটা ছোট ক্যাম্প-খাট মোড়া একধারে।

রোগী দেখা হ'ল।

ডাক্তারের হঠাৎ মনে হ'ল, রোগীর স্বাস্থ্য তো ভাল। রোগ এখনও কিছুই করে নি। নিজের 'পুঁয়ে-পাওয়া' ছেলেটিকে তৎক্ষণাৎ মনে প'ড়ে গেল, এবং তারপরেই মনে হ'ল, এদের ঘরটি বেশ পরিষ্কার

ঝরঝরে। না, দামী ছবি আসবাবপত্র বড়লোকের মত কিছু নেই, সব সোজাসুজিই।

কিন্তু ওর মনে হ'ল, ওদের যেন বেশ পছন্দ আছে। আর মনে হয়, ওরা যেন বেশ সুখী। অবশ্য সুখ বা অসুখের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে জানে না, তবু—

ডাক্তার ওষুধ লিখলে, পথ্যের ব্যবস্থা দিলে, মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলে, বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করলে, বন্ধুর স্ত্রীকে ভরসা আশ্বাস দিলে রোগ সম্বন্ধে, অবশ্য একটু অসহজভাবেই।

উঠল যখন, তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে নটা বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট। প্রায় দু ঘণ্টা হ'ল। ওর ডাক্তার মিত্রের সঙ্গে একটা রোগী দেখতে যাবার কথা আছে ঠিক দশটার সময়। ডাক্তার আর দাঁড়াল না। বললে, আবার ওবেলা খবর দিস।

ওবেলা খবর দেওয়ার আগে আপনি এল।

তারপর এবেলা ওবেলা করতে করতে কখন রোগটা হয়ে গেল টাইফয়েড, এবং অবস্থা হয়ে এল সঙ্কট, আর সপ্তাহটা দ্বিতীয়ের শেষ সীমায় পৌঁছল, মেয়ের বাপের চিন্তিত এবং মার শঙ্কিত কাতর দৃষ্টি একান্ত ক'রে ওর শরণ চেয়ে ওকে বাড়ির লোকের মত ক'রে ফেললে, ও জানতেও পারলে না।

ওর মেয়েটির ওপর হ'ল মায়া, বন্ধুর ওপর দয়া, বন্ধুর স্ত্রীর ওপর জন্মাল এমন একটা মনোভাব যেটাকে শ্রদ্ধা বলা যেতে পারে, সম্ভ্রমমিশ্রিত করুণাও বলা যেতে পারে এবং ভদ্রতামিশ্রিত মোহও বলা যেতে পারে। আসলে ওদের সাহচর্য্য লাভের একটা লোভ ওর ডাক্তারির কর্ত্তব্যের দায়িত্বের চেয়ে ওকে পেয়ে বসল। সোজা কথা, ওদের ওর ভারী ভাল লাগল, এবং এমন মুহূর্ত্তে সেই ভাল লাগার মাহেন্দ্রক্ষণ এল—যে

সময়ে ওর বাড়িতে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। ফলে ওর বন্ধুর বাড়ির সব কিছুই যেন অতিশয় অভিনব মনে হচ্ছিল। অনুর সঙ্গে যেন কেবলই তুলনার কথা মনে ওঠে।

৩

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ হ'ল। তৃতীয়ের রাত্রি যত বাড়ে, রেণুর মার শঙ্কিত চোখ ততই ওর পানে কাতর হয়ে চায়। এটা-সেটা গোছায়, আর ঘর থেকে নড়ে না।

ডাক্তার নাড়ী দেখে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা গোনে, রোগীর খুঁটিনাটির বদল লক্ষ্য করে। রাত্রি বাড়ে।

যেমন উঠতে যাবে, হঠাৎ নিরু বললে, আজকে অসিতবাবু থাকুন না। স্বামীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, যদি কালকের মতন বাড়ে?

সতীশ উৎসুকভাবে বন্ধুর দিকে চাইলে।

অসিত ডাক্তার-হিসেবে কি ক'রে হাসিমুখে রোগীর স্বজনদের অনায়াসে মিথ্যা কথায় আশ্বাস দেওয়া যায়, তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। নিরুর মুখের দিকে চেয়ে তেমনই ভাবেই বলতে গেল, না, ভয় কি আর? ভয় তেমন যদি হয়, আমি আসব 'খন ডাকলেই।

বলতে পারবার আগেই নিরু বললে, আপনার খাবার এখানে করতে ব'লে দিই না? নাই বা গেলেন আর। সেখানে ড্রাইভার গিয়ে খবর দেবে 'খন।

সতীশ বললে, আবার ডাকব কালকের মতন? তার চেয়ে থাক না আজ। কষ্ট হবে?

অসিত বললে, আচ্ছা। কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা নয়, আমি এগারোটা আন্দাজ আসব। কিন্তু আজ দরকার হবে না বোধ হচ্ছে।

নিরুর মিনতি-কাতর চোখ ওর দিকে চেয়ে থাকে। অসিত হাসলে, আপনি তো আচ্ছা ভীতু! আসব 'খন। ততক্ষণে মার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পথের লোক-চলাচল ক'মে গেল। পাড়া নিঝুম হয়ে আসে। একটি আধা-জাগ্রত অর্দ্ধেক-আচ্ছন্ন শান্তি পল্লীর পথে জেগে থাকে। সতীশ আর নিরু পথ চেয়ে থাকে।

অসিত ডাক্তারখানা থেকে বাড়ি ফেরে। খায়, যথারীতি শোবার ঘরে গিয়ে ছেলের গা দেখে, আগামী সকালের কাজকর্ম্ম কেসের কথা ডায়েরিতে দেখে রাখে, আরও কিছু বা টুকে রাখে।

ঘরের দক্ষিণের জানলা বন্ধ, মশারি-ফেলা খাটে ছেলে ঘুমোয়, বউ তখনও খেয়ে আসে নি। নিজের বিছানার দিকে একবার চাইলে। বিছানা ওর মনে কোনই মোহ জাগায় না, কর্ম্মক্লান্তের আকর্ষণও না। ও মার ঘরে গিয়ে বলে, তা হ'লে মা, আমার একটি রুগী দেখতে এখন যাচ্ছি। হয়তো আসতে পারব না।

কথার জবাব নেবার দরকার হয় না। তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, দরজা পার হয়ে গাড়ি আপনি চালিয়ে বেরিয়ে যায়।

রোগীর বাড়িতে মেয়ের বাপ জেগে ঈজি-চেয়ারে ব'সে সিগারেট খায়, আর মাঝে মাঝে হাই তোলে। ঘড়িতে সওয়া এগারোটা। মা ক্যাম্প-খাটখানিতে মেয়ের পাশে শুয়ে, মেয়ের মাথার পাশে মাথা রেখে তার একটি হাত ধ'রে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডাক্তার এসে রোগীর রোগের বিবৃতিপত্র দেখে বন্ধুর কাছে এসে বসল।

ভাল আছে মনে হচ্ছে। তবে বলা যায় না কিছু, এসে যখন পড়েছি, তা হ'লে থাকি, ইত্যাদি।

আরও রাত্রি বাড়ে। বাপ হাই তোলে আর ঘড়ি দেখে। অবশেষে বলে, নিরুকে ডাকি ?

না না, তোমরা ঘুমোও। উনি ঘুমোন না, বড় ক্লান্ত হয়েছেন। আমি আছি।

বাপও ঘুমোয়—ঈজি-চেয়ারেই। ডাক্তার মাঝে মাঝে বই পড়ে, মাঝে মাঝে রোগীকে দেখে।

নিরু একবার চোখ খুললে, তারপর ডাক্তারকে দেখে আশ্বস্তভাবে একটু হেসে আবার ঘুমোল।

কিন্তু বিপদের রাত্রি আর বিপন্নের দুঃখ কি একটা, না, একদিন ? সে রাত্রি ভাল কাটল তো অন্য রাত্রি আছে, দিন আছে। কোন দিন বা শেষরাত্রে গেল জ্বর নেবে ৯৬·৪এ, গা যায় হিম হয়ে। কোন দিন বা ১০৫·৮এ এসে বিহ্বল ক'রে তোলে। মা-বাপেরও বিহ্বলতা আসে ভয়ে। মা যেন মেয়ের মতই অসাড় হয়ে যায়।

ডাক্তার একমনে ইন্‌জেক্‌শনের ওষুধ ঠিক করে। আইডিন দিয়ে এটা মোছে, ওটা মোছে।

ডাক্তার যেন অনাসৃষ্টি দেরি করেন! নিরু ভাবে, রেণু কি হিম হয়ে যাচ্ছে! গলা থেকে যে স্বর বেরোয় 'ওগো', তা কান্নার চেয়ে বিশ্রী।

ডাক্তার চমকে ফিরে তাকায়, তারপর রোগীর নাড়ী দেখে ধমক দিয়ে বলে, ছি, করছেন কি ?

কিন্তু অত্যন্ত করুণা হয়। বাড়ি যাওয়া আর হয় না। এমনই ক'রে তিনের সপ্তাহ—ভয়াবহ তৃতীয় সপ্তাহ গেল; রোগ কমার মুখ নিলে। চতুর্থও যায় প্রায়।

ডাক্তারের নাইট ডিউটির দায়িত্ব আর যায় না।

যদি?—যদির কথা বলা যায়?

চতুর্থের শেষের দিকে সতীশ বললে, আচ্ছা ভাই, তুমি বাড়ি যাও আজ। কদিন না শুয়ে তোমার যা অবস্থা হয়েছে। দরকার পড়ে— বোধ হয় আর দরকার হবে না। কি বল?

ডাক্তার সান্ধ্য চা পান করতে করতে মৃদু হাসে।

নিরু বললে, আর কিন্তু আপনাকে কষ্ট দেওয়া অন্যায় হচ্ছে। স্বার্থপরের মত কাজ।

অসিত ভাবে, ভারী সব নিঃস্বার্থ হয়েছে আজ! একটু হেসে সে ওঠে।

৪

প্রথামত শোবার ঘরের খাটের বিছানা সাজানো পাতা থাকে। অসিত বাইরেও থাকে, আবার আসতেও পারে।

অসিত ঘরে ঢুকল। নিয়ম এবং অভ্যাসমত (যদিও কদিন অত নিয়ম ছিল না) মশারি তুলে ছেলের গা দেখে, মাথায় ঘাম হচ্ছে কি না দেখে। না, জ্বর নেই। অঘ্রাণ। কিন্তু ঘরটা কি বিশ্রী গরম! জানলা কটা সব বন্ধ। অনু অকাতরে ছেলের পাশে ঘুমোচ্ছে। অসিত মাথার কাছের জানলাটা খুলে দেয়। এই বিশ্রীভাবে সব বন্ধ ক'রে শোওয়া যে কত খারাপ, ও ব'লে ব'লে অনুকে পারে না। কিন্তু কি লাভ?

এখুনি খোকার কি হবে কে জানে, দিনের পর দিন আবার তাই নিয়ে ওকেই ভুগতে হবে।

কিন্তু ঘরের এই বদ্ধ গরমে মশারির ভেতর অনু বেশ ঘুমোচ্ছে। ওর আশ্চর্য্য মনে হয়, ওদের সবারই কি শোওয়া একরকম! নিরুও তো অমনই ক'রে ঘুমোয়। সে বা সতীশ জাগে তো একেবারেই জেগে থাকে, ঘুমোয় তো নিজের কথাই মনে থাকে না, তা ছেলেমেয়ে!

সে যাক। কিন্তু নিজের বিছানায় শুয়ে, নিজের ঘরে শুয়ে ওর না হ'ল ঘুম, না হ'ল আরাম। যেন এর চেয়ে ওখানে ঘুম হ'ত। কদিন বা ওখানে থেকেছে! কিন্তু কি অদ্ভুত, নতুন অভ্যাসেও পুরানোতে অনভ্যস্ত ক'রে দেয়!

অসিতও ঘুমোয় না। মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চায়। আকাশের অন্তহীন জ্যোতির্লেখা আর মনের অনন্ত ছায়া-লিপি মিশে যায়। মন কি বলে, কি ভাবে, ও যেন বোঝে খানিকটা। কিন্তু—কিন্তু, কি দরকার তাতে?

ও অত্যন্ত অভিভূতভাবে আড়ষ্ট হয়ে নিজের শয্যায় অপরিচিতের মত শুয়ে থাকে। ওর মনে হয়, ঐ ঘুমন্ত অনুকে ও চেনে না। ওদের কাউকে চেনে না। ও সন্ন্যাসী নয়। সুষুপ্তযশোধরাত্যাগী সিদ্ধার্থও নয় সে। কিন্তু ওর যেন সমস্ত মন অসাড় হয়ে থাকে। ঐ রুগ্ন সন্তান? হ্যাঁ, ওরই। কিন্তু মায়া হয় না ওর ওপর। শুধু মমতাহীন দয়া হয় একটু।

নিজের এই অদ্ভুত মনের ভাবকে ওর ভাল লাগে না। কিন্তু আশ্চর্য্য, ওর খারাপও লাগে না। ওর সত্য মনে হয়। কি রকম একটা অতি অদ্ভুত শূন্যতা আর একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়ব্যথিত সজ্ঞান দুঃখ ওর মনকে মথিত করতে থাকে। হঠাৎ যেন টের পায় এতদিনে যে, ও অনুকে

চায়ও নি, পায়ও নি, এবং কোন মোহ-মমতাও ওর মনে নেই তার জন্যে।

অম্বুর দিকে একটুখানি চায়, সে বেশ ঘুমোয়।

খোকা উসখুস করে। একবার একটু কাসলে।

অসিত চকিত হয়ে উঠল। উঠল, আলো জ্বাললে। অঘ্রাণ মাস। বলা যায় না, হয়তো খোকার ঠাণ্ডা লাগতে পারে। ঘড়িতে তিনটে। এতক্ষণ জেগে ছিল, না একটুও ঘুমিয়েছিল, অসিত মনে করতে পারলে না। কিন্তু আর তো জেগে থাকা উচিত নয়। জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে একখানা শতরঞ্জি আর গায়ের কাপড় বালিশ নিয়ে সে বারান্দায় বেরিয়ে এল। ডাক্তারি হিসেবেও ঘুমোনো উচিত।

বারান্দা থেকে যে আকাশ দেখা যায়, তার নীচে প্রান্তর অরণ্য না থাক, কলকাতার বাড়ির সমারোহই থাক, সে আকাশও অনেকখানি। অনেকগুলো তারা ওর দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু শীতের ঠাণ্ডার একটা নিষ্ঠুর ঘুম-পাড়ানো স্পর্শ আছে। অসিতের ঘুম আসতে দেরি হ'ল না।

যথারীতি অসিত সকালে বেরোয়। সতীশের বাড়ি একবার যেতে হবে, কাল রাত্রে রেণু কেমন ছিল! ভালই অবশ্য, তবু ওর তো কর্ত্তব্য।

সতীশের চা ও জলযোগের ব্যবস্থা টেবিলে রয়েছে।

নিরু চায়ের কথা জিজ্ঞাসা করে। ডাক্তার বসে।

সতীশ আর ডাক্তারে গল্প হয়। নিরু শোনে। ডাক্তারের মনে হয়, নিরু যেন কেমন সব বোঝে, বুঝতেও পারে। নির্ম্মল বুদ্ধির দীপ্তি ওর মুখে ললাটে চোখে দেখা যায় যেমন, এমন তো কই আর সকলের মুখে লক্ষ্য করে নি ও!

সকলে আর কে? তবে?—যাক সে।

ডাক্তার চুপ ক'রে একটু দেখে। নিরুর প্রতি যেন ওর শ্রদ্ধা-প্রশংসার শেষ থাকে না।

নিরু জানে। নিরু বুঝতে পারে ওর প্রশংসার ভাব। ওর অপ্রস্তুত মনে হয়। কিন্তু বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সতীশ জানে, সতীশ বুঝতে পারে, যেন একটু পরিহাসের ভাবে দেখে। নিরুও যেন ডাক্তারের ভক্ত, অবশ্য মেয়ের জন্যই। তবু সতীশের একটু যেন ঈর্ষাও হয়।

তোমার বেরুবার সময় হ'ল না অসিত ?—সতীশ জিজ্ঞাসা করে

ডাক্তার জবাব দেয়, হ্যাঁ, এইবার উঠি। একটু রেণুকে দেখে গেলাম। এখনও তো নিয়ম দরকার।

নিরু প্রশ্ন করে, এখনও কি ভয় আছে নাকি অসিতবাবু ?

স্নিগ্ধভাবে ডাক্তার বলে, না, ভয় আর নেই বড়। তবে ভয় হ'লে তো আমরা আছিই।

মা বলে, আর কাজ নেই আপনাদের—বাবা !

ডাক্তার অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তার মনে হয়, এরা—রোগীর স্বজনরা কি অকৃতজ্ঞ ! এতদিন ধ'রে এত কষ্ট স্বীকার ক'রে ওর সন্তান বাঁচালাম, দরকার পড়লেই আসব, তবু—। অন্য রকমও তো বলতে পারত।

সতীশ জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ হে, কোথাও একটু চেঞ্জে গেলে কেমন হয় ? তা হ'লে বোধ হয় নতুনত্বে মেয়েটা একটু সারেও শিগগির, না ?

প্রশ্নটা যেন ডাক্তারের মনকে আঘাত করে। সামলে নিয়ে সে বললে, কোথায় যাবে ভাবছ ?

তুমিই বল না ?

অসিত বলবার আগেই মেয়ের মা আর মেয়ে প্রস্তাব করলে, মেয়ের মামার বাড়ি অর্থাৎ মার বাপের বাড়ি—পাটনা।

পাটনা এ সময়ে বেশ, না ?—নিরু প্রশ্ন করে।

সতীশ জিজ্ঞাসুভাবে চায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দিন ও অন্য সব সুবিধা-অসুবিধার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। দিন আষ্টেক পরেই যাওয়া। রেণু ততদিনে দুটি ভাত পেতে পারে।

সতীশের মুখ বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। নিরুরও।

কিন্তু ডাক্তার গম্ভীর হয়ে গেল। সে গম্ভীর মুখে ওষুধ-পথ্যের কথা বলতে বলতে উঠল সেদিনের মত।

নিরু বললে, আবার ওবেলা আসবেন।

৫

ওদের যাত্রার দিন এসে পড়ল।

হাওড়া স্টেশনে ওদের গাড়িতে তুলে দিতে গেল অসিত। মেয়ের শোবার জায়গা ক'রে, বিছানা পাতিয়ে, মার বসবার জায়গা ক'রে দিয়ে, তখনকার স্বাচ্ছন্দ্য, রাত্রির সুবিধা, রোগীর ওষুধ ও আহার্য্যের নিয়ম,—নানা কথা বলে, নানা ব্যবস্থা করে সে। সব ঠিকঠাক করে।

সতীশ ব'সে সিগারেটের কেস খুলে অসিতকে দেয়।

ডাক্তার বসল রেণুর বেঞ্চিতে। নিজেরাই তো তিনজন, চতুর্থ বার্থ টায় লোক নেই। গাড়ি ছাড়তে সামান্য দেরি আছে।

সতীশ চুপচাপ সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে।

উল্লসিত রেণু অনর্গল ব'কে যাচ্ছে। তার মা কেমন অপ্রস্তুতভাবে প্ল্যাট্‌ফর্ম দেখছে।

ওই দেখ মা, চীনেবাদামওয়ালা। কবে খেতে পাব চীনেবাদাম ডাক্তারবাবু? ওমা, আজ একটা খাই? ও বাবা?

মা বললে, না, ওকি ?

বাপ জবাব দিলে না। ডাক্তার চুপ ক'রে হাসলে শুধু।

বাঁশী বাজল, ডাক্তার নেমে গেল। সতীশ উঠে প্ল্যাট্‌ফর্মে নেমে আন্তরিকভাবে ওর হাত ধ'রে খুব ঝাঁকানি দিয়ে একটা হাত ধ'রেই গাড়ির পাদানের ওপর পা দিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন ট্রেন ছাড়বার উদ্দেশ্যে, ওর বন্ধুর ওপর যে একটু বিরুদ্ধ ভাব নিরুর কৃতজ্ঞতার জন্য জন্মেছিল, সব মিলিয়ে গেল।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। বিদ্বেষ ও বিপদ মুক্ত বন্ধু এবারে আন্তরিক হেসে বন্ধুকে নমস্কার করলে। নিরুও নমস্কার করলে।

নিরু বললে, বড় ভাল আর ভদ্র, না ?

সতীশ কাগজ পড়ছিল বোধ হয়, জবাব দিলে না।

ওধারে গেছে পঁয়ত্রিশ দিন রেণুর অসুখে। আর এদিকে দিন তিনেক।

অসিতের পুরোনো নিয়ম, ধারাবাহিকতা আবার এসেছে। খোকা, অনু, মা—তাঁদের শুচিতা, চাকর, ঠাকুর, আর কাজ ও তার গোলমাল নিয়ে স্বচ্ছন্দে আছেন। পুরাতন প্রথায় একই ভাবে সংসার চলছে।

থালি মাঝে কদিন ও টের পায় নি। তাতেই ওর যেন গতিচক্রের ধরন একটু নতুন লাগছিল।

ঠাকুমার কোলে খোকা তেমনই রুগ্ন মুখে হাসে।

অনুর পক্ষে স্বামী যেন একটা অবান্তর বিষয়। সে কাজকর্ম্ম আর আচারশুচিতারক্ষা প্রথামত ক'রে যায় তেমনই।

তার স্বামী এতদিন যে ছিল আর মাঝে কদিন যে ছিল না, তার কথা ভাববার ওর অবসর নেই। ও হচ্ছে সেই জাতের স্ত্রী, কাছে থাকলে

অনুগত, অবশ্য স্বভাবানুগত ভার্য্যা, দূরে থাকলেও সেবাব্রত গৃহিণী, বিরহান্তরিতা দয়িতা নয়।

চিঠি এল। ওরা পৌঁছে খবর দিয়েছে।—রেণু বেশ ছিল, বেশ আছে। সকলেই বেশ ভাল আছে, আর খুব ভাল লাগছে ইত্যাদি।

অসিত চিঠিখানা প'ড়ে নির্লিপ্তভাবে ব্লটিং-প্যাডখানার তলায় রেখে দিলে। সে আর আশ্চর্য্য কি! ভাল লাগবেই, জানা কথা। কিন্তু ওর যেন ভারী দরকার সেটা জানা। আর রেণু ভাল আছে! বেশ, ভাল কথা। কিন্তু এ চিঠি তো জবাবের জন্যে নয়। রাখবার বা কি দরকার? তা থাকগে। চিঠি চাপা থাকে। ওর কেমন বন্ধু আর বন্ধুর স্ত্রীকে অকৃতজ্ঞ মনে হয়। মনের এক কোণে সে কথার প্রতিবাদ ওঠে। কিন্তু তবু মনে হয়।

অসিত উঠে পড়ে, বেরুতে হবে।

৬

বেশ শীত পড়েছে। রাত্রি অনেক হ'ল। অসিত কি একখানা নতুন বই পড়ছিল। টেবিলের কাছে ব'সে পড়তে বেশ শীত করতে লাগল।

অনেক দিনের পর পুরোনো নিয়মমত উঠে ছেলের টেম্পারেচার নিতে যায়। না, জ্বর নেই। চেহারাটাও যেন ভাল দেখাচ্ছে। নাড়ী বেশ ভাল। অম্বু একভাবে তেমনই একটি হাত ছেলের গায়ে রেখে ঘুমোচ্ছে। ওর নিরুকে মনে প'ড়ে গেল।

আশ্চর্য্য, আজ আর ওর দয়া হয় না খোকার ওপর। বেশ মায়ায় স্নেহে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনুর দিকে চায়। মনে পড়ল, ওর আচার-বিচার, ছেলের অস্বাস্থ্য। মনে হ'ল, সেই দধিবীজের বিরক্তিকর কথার পর আর ওর সঙ্গে বড় কথাবার্ত্তা হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য্য, সে কথা ওর মনেও ছিল না। যেন ঐ রকমই স্বাভাবিক। কিন্তু সে কি সম্পর্কহীনের মত উদাসীন? ওদের কি কথান্তর হয়েছিল? না, মনে পড়ে না তো।

অনুর ক্ষীণ দেহখানি কাত হয়ে ছেলের দিকে ঝুঁকে আছে। এখন চোখ বুজে, তাই মুখশ্রী বয়সের মতই কোমল, ছেলেমানুষ। নইলে সংসারের মধ্যে অনু যেন পিসীমার মূল্যবান পকেট-সংস্করণ—কথায় ও আচারে। ওর রকম মনে ক'রে অসিতের হাসি পেল। অনু সুন্দরী, ঘুমোলে খানিকক্ষণ দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু অন্য সময়ে? তা হ'লেও আশ্চর্য্য, আজ ওর ওপরও অসিতের মায়া হয়।

অনুর গায়ের কাপড় স'রে গেছে। কুঁকড়ে শুয়ে আছে। শীত করছে বোধ হয়। বিদ্যুৎ নিবিয়ে সে পাশের খাটে নিজের বিছানায় উঠে অনুর গায়ের কাপড় টেনে ঢাকা দিয়ে দেয়। ঠিক করতে লেপে টান পড়তে অনু বললে, উঁ?

অসিত বললে, কিছু না।

লেপটা টেনে গলা অবধি ঢাকা দিয়ে দিলে।

অনু সেটাকে আরও টেনে মুড়ি দিয়ে পাশের খাটে ওর দিকে স'রে এল। জড়িত স্বরে বললে, বড় শীত।

অসিত বললে, হ্যাঁ, লেপটা স'রে গেছে যে।

অনু আরও স'রে এল। ওর গরম নিশ্বাস অসিতের বুকের পাশে পড়তে থাকে।

কোণের আধখানা খোলা জানলা থেকে পথের আলো প'ড়ে ঘরের অন্ধকারটা যেন একটু পাতলা হয়েছে।

নিদ্রাহীন চোখে সেই আলোর পথের দিকে ও চেয়ে থাকে।

ঘরে শুধু দুটি ঘুমন্ত মৃদু শান্ত নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

অসিত অন্যমনে ছেলের বিছানার দিকে তাকায়।

ওর পাশে তার মা। ওর একেবার পাশে—ওর সন্তানের মা।

হঠাৎ অসিতের মন কি রকম অদ্ভুত অজানা দুঃখে কোমল হয়ে ওঠে। পাওয়ার মধ্যে যার পরিচয় ও জানে না, সেও হয়তো জানে না, একেবারে অচেনা, অথচ দিনের সঙ্গে রাত্রির সম্পর্কের মত যার সঙ্গে সম্বন্ধ একান্ত নির্ভরশীল, আপেক্ষিক, অচ্ছেদ্য যেন,—সেই অপরিচিতা, অপরিচিত ওর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতায় কেমন নিশ্চিন্ত, তৃপ্ত।

ওর মন পরম করুণায় ভ'রে যায়। অনুর পিঠে হাত রাখে।

পাতলা ঘুম-চোখে অনু আবার বলে, কখন এলে?

যেন রোজই একভাবে কেটেছে, একটুও ফাঁক পড়ে নি, যতি ছিল না, ব্যতিক্রম হয় নি। স্বামীর মনের পরিচয়ও সে জানে না যে, তাও বোঝে না যেন।

সকরুণ আদরে অসিত তাকে বলে, ঘুমোও।

আজ আর তার অনুর ওপর বিরাগ হয় না, বিতৃষ্ণা আসে না, এমন কি ওর বিপর্য্যয় আচারের কথাও মনে থাকে না।

নিছক দয়াতে ওর মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার মনের উদ্বেলিত করুণাসাগরের তরঙ্গের মাঝে কোন কিছুই, কাউকেই স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় না—অনুকেও না, নিরুকেও না। ও যেন সেই 'ঘরে বাইরে'র ভাঙা আরশি।

কি জানি কেন, অসিতের গোপন অজানা মন কেবলই বলে, আহা!

সে যেন আজ জানতে পারলে, ওই অনু তার দয়িতা নয়, প্রিয়া নয়, ও দয়ার পাত্রী।

আর আস্তে আস্তে সেই 'আহা'টা মস্ত হয়ে, বিরাট হয়ে ওর সমস্ত মনের মোহ, প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা সব ঘিরে ঢেকে ফেললে।

ওর বাহুর মূলে মাথা রেখে নিরুদ্বেগ ঘুমে আচ্ছন্ন অনু। অসিত নির্লিপ্ত উদাস ভাবে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে।

অপরিসীম শ্রদ্ধা, আনম্র প্রেম, দুর্ব্বার মোহ, কোন কিছুই ওর নেই,—ও জানতে পেরেছে।
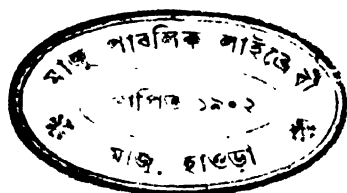
গঙ্গাফড়িং

খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। সন্ধ্যা বৃষ্টির মধ্যেই নেমে এলেন। বৃষ্টি যখন ছাড়ল, তখন বিকাল আর সন্ধ্যা দুই শেষ হয়ে ঘন অন্ধকার রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে।

খেলার সুবিধা আর রইল না। বন্দী বালক-বালিকার দল নিরুপায়-ভাবে একবার অঙ্গনে বেড়িয়ে এল, তারপর একবার ঘরে বেড়িয়ে এসে শেষে ঘরের দালানেই জটলা ক'রে দুরন্তপনার উপায় আবিষ্কার করতে লাগল।

ইতিমধ্যে খেলার উপকরণ পাওয়া গেল ঠিক হাতের পাশেই; আলোর চারধার থেকে নিয়ে সমস্ত দালানটা নানাবিধ পোকা আর ফড়িং পিঁপড়েয় ভ'রে গেছে।

'ইঃ, স'রে ব'স ভাই, তোর দিকে যাচ্ছে', 'মাগো, তাড়িয়ে দাও না ভাই', 'ওকি দাদা, ওদের মেরো না', 'উঁহু, খোকা, ধ'র না'—নানা রকম সুরের মাঝখানে হঠাৎ ঠক ক'রে একটি ভারী ধরনের শব্দ হ'ল।

খোকা শিউরে ব'লে উঠল, দিদিভাই, আমাল মাথায় কি? ততক্ষণে সেটা আবার একটা লাফ দিয়ে আর এক দিকে পৌছল। ঐ দেখ, কি পাখী!—খোকা বললে।

একটি বৃহদাকার গঙ্গাফড়িং। পাখীই বটে!

দাঁড়া দাঁড়া, মজা করি।—পকেট থেকে লাট্টুর সুতো বের ক'রে নিয়ে সন্তর্পণে অজিত পাখীটি ধরতে গেল। সেটি আবার দালানের ও কোণে গিয়ে পৌছল।

খানিকক্ষণ হৈ হৈ ক'রে অজিত সেটিকে ধ'রে ফেললে।

বিরাট একটা কোলাহলে সকলে অজিতকে ঘিরে দাঁড়াল। সবুজ রঙের ডানা, তুটি কালো মরিচের মতন গোল চোখ, আর দেড় বিঘৎ লম্বা মোড়া তুখানি পা, দেখতে দেখতে সে আবার লাফ দিলে।

এবারে একেবারে তার কর্ম্মসূত্র মানুষের হাতের লাট্টু-সূত্রে বাঁধা প'ড়ে গেল। লাট্টুর সুতোয় তার একখানি পা বেঁধে অজিত পরমানন্দে তাকে একটি পেরেকে টাঙিয়ে দিলে।

সে একবার ক'রে লাফ দেয়, বোধ হয় দিয়েই বুঝতে পারে বাঁধা আছে, আবার স্থির হয়ে চুপ ক'রে মরিচের মতন কালো গোল চোখে চেয়ে থাকে, কোন্ দিকে তা বোঝা যায় না।

অজিতের খুল্লতাত দিদি ফড়িংটির বন্ধন-দশা দেখে বার তুই বললে ছেড়ে দে না রে, আহা! কি কষ্ট দিতে ভালবাসিস! ঠাকুমা বলেন, ও রকম করলে পাপ হয়। যদি পাটা ভেঙে যায়?

পতঙ্গটার পায়ের সুতো আলগা হয়ে গিয়েছিল, নীচু হয়ে সেটা ঠিক করতে করতে সে বললে, ঠাকুমাকে কে বলছে? আর দেখ না, পায়ের সুতো কত ঢিলে আর লম্বা—ও ভাঙবে কি ক'রে?

ভাঙবে যে কি ক'রে, তা দিদি বোঝাতে পারলে না। কিন্তু তার প্রতি লাফের সঙ্গে ভাঙবার সম্ভাবনা কেবলই মনে হচ্ছিল।

হ্যাঁ রে, খুকীর মাথাটা ভিজে জুবড়ি, খেতে গেল দেখলাম। সব বুঝি ভিজছিস?—বলতে বলতে একজন মা প্রবেশ করলেন। উ, কি কাণ্ড! নিদ্দুষী জীবের পা বেঁধে খেলা করা! দে ছেড়ে, ম'রে যাবে যে।

একটি ভৃত্য এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সে স্বভাষায় বললে, ও অতিশয় নির্দ্দোষী জীব এবং বিধাতার ঘোটকী, ওকে ছেড়ে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

সব ভূত! ছেড়ে দিয়ে খাবি আয়।—ভিজে খুকীর মা সমস্ত বালক-বালিকাদের নিয়ে প্রস্থান করলেন অজিতকে খুলতে আদেশ দিয়ে।

অজিত ছেড়ে দেবার ভান করেছিল মাত্র, ছেড়ে দেয় নি। সুতরাং বিধাতার মর্ত্ত্য-জনরব-লব্ধ ঘোটকী আপাতত অজিতের লাগামেই আবদ্ধ র'য়ে গেল। অন্ধকার দালানে বারম্বার লাফ খেয়ে সে পথ খুঁজে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। অজিতরা খেতে গেল।

এবারে নিদ্রাতুর পৌত্র-পৌত্রীদের ও অন্য শিশুদের চোখের ঘুমকে আর খানিকক্ষণের জন্য আনাচ-কানাচে বেড়িয়ে আসার জন্যে তখন রান্নাঘরের সুমুখে ঠাকুমা রূপকথার অপরূপ আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ও ঠাকমা, ঐ মেজদা আজকে একটি গঙ্গাফড়িং ধরেছে। বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে পেরেকে।—একটি ভগ্নদূত-মুখে বার্ত্তা পৌঁছল।

অজিত তখন ঠাকুমার পাশে।

ওমা, ছি ছি! অমন ক'রে জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়? দিতে নেই। খুলে দিয়েছ তো?

অজিত অপ্রস্তুতভাবে না-সূচক মাথা নাড়লে।

যে যেমন কাজ করে, সে তেমনই ফল পায়। পাপ হয়। যে জীবকে কষ্ট দেয়, তাকে তেমনই কষ্ট পেতে হয়। কারুকে কষ্ট দিতে নেই। এক মুনির গল্প তোমাদের বলব 'খন।—পিতামহী বললেন।

নানাবিধ পাপপুণ্য, মাণ্ডব্য মুনি, রত্নাকর মুনি, পাপের বয়স, তার ক্ষমা, বিশেষ বয়েসের বিশেষ ফল, পঞ্চম বর্ষের পর অপরাধ হওয়া—ইত্যাদি পিতামহীর জ্ঞানের ভাণ্ডারের সঞ্চিত কাহিনী বালক-বালিকাদের গোচরীভূত হতে লাগল।

খাওয়া শেষ হ'ল। চিন্তিত শিশুদল শয়ন করতে গেল। শুয়ে শুয়ে দিদি জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁরে, ছেড়ে দিয়েছিস?

না, আমার একলা ভয় করছে। কাল দোব 'খন। তুমি চল না।

দিদি বললে, আর পারি না, থাকগে। কালই দিস।

একজন জিজ্ঞাসা করলে, পাপ কি ভাই? কি রকম দেখতে?

দূর, সে কি দেখা যায়!—দিদি জবাব দিলে।

নানাবিধ ভাবনার মাঝে ছেলেদের তন্দ্রা আসতে লাগল।

দরজার পাশ থেকে, ছাদের কোণ থেকে ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল ভরা মাথা কার দেখা যায় মনে হয়। কোন বার বা সাদা কাপড় পরা ছায়ার আভাস ভেসে আসে। পাপ কি রকম দেখতে হয়?

অজিতের ঘুমের ঘোরে মনে হ'ল, কে একজন পাপ যেন সবুজ ঘোমটায় মুখ ঢেকে তার খাটের কাছে নত হয়ে কি দেখছে। অপ্রসন্ন মনে কেবল ঘুম ভাঙে।

দালানে শুধু অনেকক্ষণ পরে পরে, ঠক ঠক ক'রে শব্দ হয়।

সকালবেলা। শিশুরা এসে দাঁড়াল।

একটা শালিক ওদের দেখে উড়ে গেল ফড়িংটার কাছ থেকে।

দেখা গেল, সমস্ত রাত্রি এক পায়ে বাঁধা থাকায় লাফালাফি ক'রে তার একটা পা একেবারে লম্বা হয়ে গেছে—যেন একগাছা খড়। অজিত কাছে এসে নীচু হয়ে দেখতে পেলে, একটা সবুজ ডানা মাটিতে প'ড়ে, আর পাখার আবরণী থেকে খুলে যাওয়াতে তার সমস্ত গাটা শালিকটা ঠুকরে ঠুকরে তাকে প্রায় শেষ ক'রে আনছিল।

অজিত শুষ্ক মুখে সেটাকে নেড়ে-চেড়ে একজনকে বললে, ভাই, একটু জল আনবি?

জল এল, পায়ের দড়ি খুললে, সে একটু নড়লও; কিন্তু উড়তে পারলে না।

দড়ি খোলার পর একটু অন্যমনস্কতার সুযোগে হঠাৎ সেই শালিকটাই সেটাকে নিয়ে উড়ে গেল।

বালক-বালিকারা বিমূঢ়ভাবে চেয়ে রইল।

২

ষোলো-সতরো বছর পরে।

'মাসীমা' ব'লে ডেকেই একটি যুবক বড় বাড়ির পাশের ছোট্ট বাড়িতে প্রবেশ করলে।

কে অজিত? এস বাবা।—'মাসীমা' আহ্বানে অভিহিতা নারী এগিয়ে এলেন।

রান্নাঘরের দরজায়ও একখানি স্নিগ্ধ স্মিত মুখ দেখা গেল।

আমার জন্যে একটু চা ক'রে পড়া দিবি আয়। আমি ছাদে বসিগে।—অজিত বললে।

ব'স বাবা। সুবি, চা ক'রে দিয়ে আয়। আমি সন্ধ্যেটা সেরে নিই। মাসীমা রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন।

সুবালা চা ক'রে বই নিয়ে ওপরে উঠল। মাও ওঠেন কাজ সেরে।

পরিচয় হয়েছিল বছর ছয়েক আগে সন্ধ্যাবেলা, তখন সুবালার বাপ হঠাৎ একদিন হার্টফেল ক'রে মারা যান।

তারপর এমনই ক'রে দিন যায়। অজিতরা দেখাশোনা করত, পাড়ার লোকে দয়া-শ্রদ্ধা করত। তখন সুবালা ছিল নয়-দশ বছরের বালিকা।

তারপর সুবালা পড়ে। মাসীমা, তন্থা কন্থা, পড়া, গল্প, কদাচ কোন দিন চা খাওয়া ;—স্রোতের মতন দিন কখন ব'য়ে চলল।

সুবালা সরলভাবে হাসে, সুন্দর দাঁতগুলি, হাসিটি মধুর ; কথা কয়, গল্প করে, নির্ভীক মন কিছু ভাবে না।

মা ভাবেন, কি আর বড় হয়েছে, এখন একটু পড়ুক। যা কিছু পুঁজিপাটা আছে, বিয়ে দিয়ে তারপর চোখ বুজবেন।

অজিত ভাবে, কি সরল মুখ, সুন্দর হাসিটি !

অজিতও চব্বিশ বছরে পৌঁছল, সুবালাও যোলোতে। ও বাড়িতে অজিতের বিয়ের সম্বন্ধ আসে।

হঠাৎ মা ভাবলেন, সুবি তো দেখতে মন্দ নয়, ভালই। আর তুটিতে বেশ মিলও তো, ব্রাহ্মণের ছেলে, স্বঘর।

তার আগেই অজিত সেটা ভেবেছিল। ভাবনার ঐক্যে তুজনেই সন্তুষ্ট আহ্লাদিত হলেন। সুবালার কানেও সংবাদটুকু পৌঁছল।

তা বাবা, একবার ব'লে দেখ না।—বিধবা অজিতকে বললেন।

অজিত রোজই ভাবে ; ভয় করে, ভরসা হয় না। বাপকে তার বলতে সাহস হয় না, মা নেই। অবশেষে সে সতীর্থ আর বন্ধু জিতেনকে দিয়ে বলালে।

বড় বাড়ির কর্ত্তা যেমন হতে হয়। জিতেনকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, যা অসম্ভব তা অসম্ভবই থাকে। এটা ও বাড়ির বিধবার এবং তাঁর পুত্রের বোঝা উচিত। বাড়াবাড়ি করলে, উত্তরাধিকার, মানে—এই ঘর-বাড়ি, টাকা-কড়ি, গাড়ি-মোটর, সব আশা ছেড়ে দেয় যেন।

তখন সুবালার পড়া শেষ হয়ে গেছে। তুরাশামুগ্ধ তরুণ হৃদয় বেশ নিশ্চিন্ত মনে অজিতের বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় আপনার ছোট্ট

কোমল করপল্লবটি ছেড়ে দিয়েছে। স্বপ্নলোকে আকাশকুসুম অনেক ফুটেছে ; বাকি শুধু বাস্তবে ফুটে ওঠা।

অজিত !—মোটা গলায় কে ডাকলে।

সুবালার মা এসে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন।

কি রে ?—ব'লে অজিত উঠে এল।

তিনজনে দাঁড়িয়ে যে কথা হ'ল, তাতে বাকি আর কিছু রইল না শোনার।

অজিত বেরিয়ে গেলে, জিতেন একবার চেয়ে দেখে চ'লে গেল।

মনোভঙ্গের অসহ্য দুঃখে মাতা-পুত্রীর চার পাঁচ দিন কাটে। অজিত ডাকলে, মাসীমা !

গম্ভীর মুখে বিধবা দরজা খুলে দিলেন।

অজিত যা বললে, তার মর্ম্ম এই, সে বাপের অগোচরে বিবাহ করবে কিম্বা তাঁর অবর্ত্তমানে করবে, এখন করবে না।

বিধবা চুপ ক'রে রইলেন। অবর্ত্তমানে, সে কত দিন ? অগোচরে, সে কেমন ক'রে ? এখন নয় তো সুবি কত দিন প'ড়ে থাকবে ? এমনই ধারা প্রশ্ন মনে ওঠে। মনে হয়, অসম্ভব কথা বলেছে অজিত। তবু দুরাশা উঁকিঝুঁকি মারে।

সুবালার সব বিশ্বাস হয় সম্ভব ব'লেই। কেন হবে না ? হতে পারে সবই। সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতে সুবালার বিশেষ ভেদ ছিল না। নিজের অন্তঃকরণটির মতন, স্বচ্ছ চোখ দুটির মতন সবই নির্ম্মল সহজ।

অজিত আসে যায়। সুবালার মনে হয়, ক্রমে সুবালার আরও মনে হয়, হয়তো সম্ভব সবই।

কিন্তু অজিতের বাবা যে ঢের বেশি বুদ্ধিমান অজিতের চেয়ে, তার প্রমাণস্বরূপ সকলের অজ্ঞাতে একদা শুভলগ্নে অজিতের একসঙ্গেই আশীর্ব্বাদ ও গায়ে হলুদ হয়ে গেল। তিন দিন পরে বিবাহ। বাল্যকালের দিদি, দাদা, কনিষ্ঠা, কনিষ্ঠদের এবং খুড়ীমা, জ্যেঠীমা, পিসীমাদের আগমনের কোলাহলে সুবালার মা চকিত হয়ে প্রতিবাসীর ঝিকে প্রশ্ন করাতে সব সংবাদ জ্ঞাত হলেন।

সুবালা আড়ষ্ট পাথরের মতন চোখে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যেবেলা। কে ডাকলে, দরজাটা খুলুন তো?

সুবালার মা দোর খুলে দেখলেন, জিতেন।

জিতেন বন্ধুর অবিশ্বস্ততায় বিরক্তি-প্রকাশ ও আক্ষেপ ক'রে অনেক সমবেদনা প্রকাশ করলে।

সুবালার মা ব্যাকুল বেদনায় চুপ ক'রেই ব'সে ছিলেন, অবশেষে বললেন, বাবা, আমাকে একটা জায়গা ঠিক ক'রে দিতে পার, আমি আর এমন ক'রে থাকতে পারছি না।

মায়ের কথায় শুষ্ক ক্লান্ত চোখ তুলে সুবালাও একবার জিতেনের পানে চাইলে। স্বল্প জ্যোৎস্নায় শুধু দৃষ্টিটি চোখে পড়ল।

৩

পথের ওপারে মুড়ির দোকান, বেশ বড় দোকান। মুড়িও বোধ হয় বিক্রি ভাল রকম হয়। দিনরাত্রি ভিড় থাকে। গরিব জনমজুর, বড়লোকের ঝি-চাকর সবাই নিয়ে যায়।

এক ধামা মুড়ি নিয়ে একটি মেয়ে আসে একটি ছেলের সঙ্গে,—সেই মুড়ি দিয়ে যায়। বেশির ভাগ সন্ধ্যেবেলায় সে আসে, কোন দিন বা দুপুরের শেষে।

বন্ধুর ডিস্পেন্সারিতে কি কাজে এসে ব'সে অজিত গল্প করছিল। রাস্তার দৃশ্য যেন সিনেমার ছোট ভাই ; তাতে ওপাশে পানের দোকান, খাবারের দোকান, চিঁড়ে-মুড়ির দোকান, ভিড় লেগেই আছে। কাজ না থাকলে বায়স্কোপ দেখতে যাওয়া আর রাস্তার লোক দেখা প্রায় দুই সমান—অজিতের তাই মনে হয়।

ওপারে পানের দোকানের প্রকাণ্ড আরশিতে দুটি কালো চোখের ছায়া পড়ল, বিদ্যুতের আলো সেই মুখে পড়েছে। মুখ স'রে গেল। একখানা ভাড়া গাড়ির ছায়া। পান কিনতে এসেছে এক বাড়ির ঝি, তার হাত-মুখ নাড়ার ছায়া।

ও চোখ কার? মুখটা তো মনে পড়ে না, চোখ দুটি তো চেনা, কিন্তু— ; কার? প্রশ্নে মন ভ'রে যায়। অজিত অন্যমনে ওষুধের শিশি টেবিলে ফেলে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা না ক'রেই উঠে পড়ল।

বাড়ি গিয়ে মনে পড়ল ওষুধের কথা। ঘরে ঢুকে আলো নিবিয়ে শুয়ে দৃষ্টি পড়ল পাশের বাড়িতে। সেখানে ভাড়াটে এসেছে অন্য, যেমন তারা চেঁচায়, তেমনই ঝগড়া করে। মনে পড়ল, ও চোখ সুবালার।

মেয়ে ডাকলে, বাবা, খাবে চল।

যাই মা।—বাপ উঠে বসল। মাতৃহীনা কন্যার সঙ্গে না খেলে মেয়ের খাওয়াই হয় না।

মেয়ের মা বিয়ের পর পাঁচ বছর প্রায় বেঁচে ছিল। অজিত তাকে ভালবেসেছিল কি না কে জানে, কিন্তু তাকে তার ভাল লেগেছিল।

সুবালার চোখ গভীর কালো, এর চোখ একটু নীলাভ। সে ছিল সরল, অপ্রস্তুত হাসিমুখ; এ ছিল আদরিণী দুহিতা, তেমনই ধরনের সপ্রতিভ আদুরে মুখ।

রাত্রে জল খেতে উঠে সুবালাদের খালি বাড়ি চোখে পড়েছে। ব্যাকুলভাবে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বিছানায় ফিরেছে। পাশে নিদ্রিতা, তেমনই ধারাই বয়স, একান্ত নির্ভরশীলা কিশোরী পত্নী। চোখে জল ভ'রে এসেছে। সে তার মাথায় মুখ রেখে জাগিয়ে দিতে চায়; সুবালার ওপর অবিচার যেন ভুলে যাবার পথ পায় না। স্ত্রী জেগে ওঠে, বিস্মিত হয়ে স্বামীর মুখপানে চাইতে যায়। অজিত তার মাথাটা নীচু ক'রে দিয়ে বলে, জেগে উঠলে বুঝি? না, তুমি ঘুমোও।

তন্দ্রাজড়িতস্বরে স্ত্রী বললে, আহা, জাগিয়ে তো দিলে! শুধু এইটুকু কিশোরী তরুণী নারী বুঝতে পারে, ওটা সোহাগ নয়, আদর নয়, তার চেয়ে গভীর কিছু, যার সঙ্গে ওর পরিচয় স্বামী ক'রে দিতে চান না।

এমনই ভাবে স'য়ে যেতে যেতে, ভুলে যেতে যেতে সহসা কন্যার জন্মের পর একেও হারিয়ে ফেললে।

বাপের বিছানার পাশে, ছোট খাটে মেয়ের বিছানা। খাওয়া হ'লে দুজনে এসে শুল।

বাবা, তুমি বুঝি আজ আর পড়বে না?

না।—মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বাপ বললে, আমার কতগুলো পাকা চুল হয়েছে দেখ্ তো।

রাত্তিরে বুঝি পাকা চুল দেখা যায়? আর তুমি কি বুড়ো?

বুড়োই তো, দেখ্ না খুঁজে। এক একটা চুলের দাম এক এক টাকা।

ইঃ, রাজা যেন! আচ্ছা দেখি!—মেয়ে বালিশের পাশে ব'সে পাকা চুল খোঁজে।

না বাবু, নেই, মোটে তিনটে। আমার ঘুম পাচ্ছে।

পিতার মনে হচ্ছে, কি ক'রে সময় কাটে, কোন্‌টা স্মরণীয়, কোন্‌টা ভোলা যায়!—আচ্ছা শো, আমার পকেট থেকে কাল টাকা নিস।

বালিকা নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে। ঘর অন্ধকার ক'রে অজিতও শুয়ে থাকে। সবুজ রঙের শাড়ি প'রে মস্ত গঙ্গাফড়িং। সুবালার মত দেখতে চোখ দুটি, সেই যার ছোটবেলায় পা ভেঙে দিয়েছিল, তারপর শালিকে ঠুকরে মেরে ফেললে। খাটের পাশে পাশে সে বেড়িয়ে বেড়ায়। ঘোমটা স'রে যায় যখন, একবার মনে হয়, সুবালা কি? একবার মনে হয় মৃতা পত্নীকে।

ঘর্ম্মাক্ত হয়ে ঘুম ভেঙে গেল, জলের কুঁজো সুবালাদের বাড়ির জানালার দিকেই। জল খেয়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে, আবার এসে শুয়ে পড়ল। মনে পড়ল, সেই বৃষ্টির দিনের গল্প—ফড়িং ধরা, পিতামহীর কাছে গল্প শোনা—পাপ কি? পীড়ন, না অসম্মান? না, অবিচার? না, কি? প্রায়শ্চিত্তই বা কি? কর্ম্মফলই বা কি? কারটা কে ভোগ করে? অভিভূতের মতন কখন ভাবনার মাঝেই আবার ঘুম আসে।

৪

সেদিন থেকে অজিত প্রায়ই সেই ডিস্পেন্সারিতে এসে বসে। মনে হয়, যেন ও সুবালাই। ভেবে পায় না, কি জন্যে সে তাকে খোঁজে, তবু সমস্ত অন্তর কি একটা বেদনায় বিমূঢ়ভাবেই ওকে খোঁজে।

দিন পনরো পরে আবার দেখা গেল, সেই নারী এক ধামা মুড়ি নিয়ে দোকানে দাঁড়িয়ে, আর ছেলেটি সঙ্গে।

অজিত ছুতো ক'রে উঠে গেল, কিন্তু মুড়ির দোকানের সুমুখে কি সুত্রে যায়, তা আবার ঐ দিনের মতন আলোকিত পথে ?

ফিরে আসে। মুখ আর দেখা যায় না, স্পষ্ট চেনাও যায় না, তাই ভয়ও করে।

অবশেষে একদিন ছেলেটি একলা এল, প্রায় মাস দুই পরে।

অজিত তাড়াতাড়ি নেমে এল রাস্তায়। ভিড় কাটিয়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে ছেলেটির কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলে। বালক সভয়ে ফিরে চাইলে।

অজিত জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কোথায় ?

যে চোখ দুটি ত্রস্ত বিস্ময়ে ওর পানে চেয়ে ছিল, সে দুটি সুবালারই চোখ।

বালক ভীত ক্ষীণ স্বরে বললে, ঐ গলিতে।

অজিত তার চোখ দেখছিল, বললে, কোথায় ?

বালক সভয়ে বললে, ঐদিকে। সে স'রে দাঁড়াল।

উনি, ওই যে—তোমার কে ?

কাঁদ-কাঁদ সুরে বালক বললে, আমার মা।

অভিভূত অজিতকে আর জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়ে বালক জনতার মধ্যে মিশে গেল।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে তার পরদিন, তোমার হয়েছে কি ? ঐ একটা ছোঁড়ার সঙ্গে খামকা কথা কইছিলে কেন ? পকেট কেটেছে নাকি ?

অজিত অপ্রস্তুতের হাসি হাসলে। কি উত্তর দিলে নিজেই সে বুঝতে পারলে না।

অনেক দিন আর ও সময়ে মেয়েটিও আসে না, বালকটিও না।

অজিতের বেদনাও ছাড়ে না, আশাও। অবশেষে গলিতে ঢুকে পড়ল একদিন। খানিক দূর গিয়ে একটি ছোট ঘরের সুমুখে বালকটিকে দেখলে পড়া মুখস্থ করছে পথের পাশের এক দোকানের আলোয়।

খোকা, তোমাদের বাড়ি কি এখানে? অজিতের প্রশ্নে বালক চকিত হয়ে চাইলে।

অনিচ্ছায়, ভয়ে সে দেখিয়ে দিলে ঘরের দরজা। অজিত ঢুকে পড়ল উঠোনে, তার পেছনে বালকটিও এসেছিল। প্রাঙ্গণবাসীরা আশ্চর্য্য হয়ে দুজনের দিকে চেয়ে রইল।

বালক ডেকে বললে, মা, একবার এস।

অজিত সেই দিকে এগিয়ে গেল।

একটি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালা, একটি নারী নত মুখে কাশীদাসের মহাভারত পড়ছে। চুলগুলো পিঠ ভ'রে ছড়িয়ে আছে, আঁচলের প্রান্তটুকু মাথায় দেওয়া মাত্র।

পুত্রের আহ্বানে জননী সাড়া দিলে, কি রে? কেন? কণ্ঠস্বর মৃদু, যেন চেনা।

অজিত এসে দাঁড়াল।

সুবালাই বটে। শুধু চোখ আর চুল তার; আর কিছু চেনবার মত নেই।

সুবালা অবাক হয়ে চেয়ে থেকে খানিক পরে চিনতে পেরে উঠে দাঁড়াল।

পুত্র জিজ্ঞাসা করলে মার পেছনে এসে, কে মা উনি? সেদিন তো দোকানের সামনে উনিই কথা কয়েছিলেন।

জননী সামান্য ইতস্তত ক'রে আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, তোমার মামা হন। তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

অজিত তার ক্ষীণ জীর্ণ দেহের পানে চেয়ে ছিল,—মুখের হাড় সব দেখা যাচ্ছে। অপ্রস্তুতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি চিনতে পার নি?

সুবালা ঘর থেকে একখানি ছোট মাদুর এনে পেতে দিলে।

৫

কেমন আছ? মা কোথায়?—ছেলের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হ'ল না, কেন না সুবালার পরিধানে থান।

ভাল আছি। মা মারা গেছেন।—সুবালার দুটি কথায় উত্তর হয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে থাকে।

খোকার কি নাম?—অজিত জিজ্ঞাসা করলে।

ওর নাম মাণিক।—মহাভারতের পাতা উলটোয় সুবালা।

অনেক চেষ্টার পর সহসা অজিত বললে, তোমরা কোথায় চ'লে গেলে তখন?

কখন?

সেই সময়ে।

মুখ নীচু ক'রে সুবালা প্রদীপটি উসকে দিতে লাগল। তারপর মনে হ'ল, বড় আলো হ'ল। আবার কমিয়ে দেয়। নত চোখ থেকে দু তিন ফোঁটা জল ঝ'রে পড়ল। মাণিক বাইরের আলোয় পড়তে গেছে।

একটু থেমে সে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি সত্যি সব কথা জানতে চাও? চোখে মনে হ'ল সাগর চকচক করছে, কিন্তু ঝরল না।

অজিত নীরবে উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে তার পানে চেয়ে রইল।

সুবালা আস্তে আস্তে এক সুরে সমস্ত বেদনা, গ্লানি, দুঃখ, অপমান, দারিদ্র্য, শোক, সান্ত্বনা সব কিছুকে—যেন বর্ষণের আগের শ্রাবণের আকাশের মতন থমথমে গভীর গম্ভীর ভাবের এক সুরেই বেঁধে নিয়ে এক এক ক'রে ব'লে যেতে লাগল। সেই জিতেনবাবুর আগমন, সমবেদনা প্রকাশ, জননীর ব্যাকুল দুঃখে পরদিনই সেই বাড়ি ছাড়া, অজিতের বিবাহের সকল সংবাদ পাওয়া, মায়ের মনোভঙ্গে পীড়িত হওয়া, জিতেনবাবুর সাহায্য গ্রহণ, অবশেষে তাঁর তাকে গ্রহণ করার স্বীকৃতি, জননীর নিশ্চিন্ততা, তাঁর আসা-যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা। সুবালা একটু থামলে।

তারপর জিতেনবাবুর জননীর অমত।

অবশেষে মা বুঝলেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। তারপর কথান্তর এবং জিতেনবাবুর একেবারে প্রস্থান।

এক মুহূর্তের মধ্যে তার মুখ লজ্জিত বেদনার আভাসে আরও ছোট্ট হয়ে গেল। অজিত একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে ছিল।

তারপর মাণিক হ'ল।

অপমানিতা উৎপীড়িতা নারী মাথা নীচু ক'রেই ছিল। কথার সুর এত মৃদু, যেন তার নিজের কানেও পৌঁছবার ভয় হচ্ছে।

অজিত চমকে উঠল, Coward, ইতর! পরক্ষণেই মাথা নীচু ক'রে নিলে। শুধু কি জিতেনই?

সুবালা মুখ নীচু ক'রেই ছিল।

আমি ভেবেছিলাম, তোমার—। অজিত আর বলতে পারলে না।

না, আমার বিয়ে হয় নি।—প্রশ্নটি এই জবাবে সে শেষ ক'রে দিলে। তারপর বছরখানেক কি কিছু বেশি পরে মার মৃত্যু হ'ল।—আবার

ব'লে যায়। অজিত নিরতিশয় পীড়িত বেদনায় ওর মুখের পানে চাইলে। দৃষ্টিতে যেন 'আরও তারপর?' জিজ্ঞাসা।

এবার সুবালা সহজভাবে মুখ তুললে।

তারপর অনেক কষ্ট পেলাম।

আমার খোঁজ একবারও কেন করলে না?

মনে হয় নি, বুঝতেও পারি নি। আর তুমি কি—। সুবালা থেমে গেল।

যাক। তারপর?—অজিত বললে। সে বুঝলে, সুবালা আসতে পারে, এমন কিছু নির্ভরযোগ্য কাজ সেও করে নি।

তারপর ঐ রকমে দুঃখ পাবার ভয়ে অনেক পালিয়ে বেড়ালাম।

আবার কষ্ট পেলে?—সাশ্চর্য্যে অজিত জিজ্ঞাসা করলে।

আর পাব না? বুঝতে পারছ না?—বেদনা, তিরস্কার, অনুযোগ, অভিযোগ-ভরা কণ্ঠে সুবালা বললে।

অজিত চুপ হয়ে গেল।

শেষে ঐ কামার-গিন্নীর পায়ে ধ'রে, ধর্ম্মমা ব'লে, এখানে রয়েছি এই ন বছর। প্রথম প্রথম ও মুড়ির চাল এনে দিত, ভাজা হ'লে দিয়ে আসত। এখন খোকাকে নিয়ে আমিই যাই।

চৌকো আগুনের মাথার ওপরের আকাশটুকু থেকে তারারা নীচু মুখে দেখছিল। হয়তো শুনতেও পাচ্ছিল সুবালার কথা। বাড়ির ওধারে তখনও কামার-গিন্নীর ঘরে খাওয়া-দাওয়া চলছে।

৬

অজিত অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলে বললে, সুবালা, চল আমার বাড়িতে।

সুবালা অবাক হয়ে অদ্ভুতভাবে ওর পানে চেয়ে রইল।

যাবে?—আবার প্রশ্ন করলে অজিত।

কোথায়?—মূঢ় দৃষ্টিতে সে জিজ্ঞাসা করলে।

আমার বাড়িতে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। তোমার সম্মান মর্য্যাদা সম্পূর্ণ বজায় রেখে তুমি আলাদা থাকবে।

সুবালা চেয়ে রইল নির্ব্বোধের মতন।

কার কাছে থাকব?

আমার বাড়িতে। আমার মেয়ে আছে, তার অভিভাবকের মতন তুমি থাকবে।

সুবালার চটকা ভাঙল।

না। তোমার স্ত্রী কি বলবেন? আর—সে হয় না। তিনি কিছু না বললেও আমি যাব না।

তিনি নেই, থাকলেও তিনি কিছু বলতেন না।—অজিত বললে।

সমবেদনা-ভরা চোখে সে অজিতের পানে চাইলে। কিন্তু বললে, না, আমি যাব না।

আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। আমি আমার মেয়ের সঙ্গে মাণিকের বিয়ে দোব। তুমি চল। তুমি জান না, আমি নিজের কাপুরুষতায় কত কষ্ট পেয়েছি।

সে বিশ্বাস করছি। কিন্তু আমি যাব না।

তুমি কি আমাকে একটু শান্তিও পেতে—শান্তিও পেতে দেবে না? অজিত ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে। আমার প্রায়শ্চিত্ত করি—

বিয়ে দেওয়াতে কি আর হবে, আবার হয়তো তোমার নির্দ্দোষ মেয়েটি আমার ছেলের হাতে কষ্ট পাবে। ওই কি বড় হয়ে—যাকগে।

লজ্জিত অপ্রতিভ অজিতের অর্দ্ধসমাপ্ত কথাটার শেষ বুঝতে বাকি রইল না। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে সে আবার বললে, তোমাদের এখন কি ক'রে—? ব'লে থমকে গেল।

সুবালার মুখে একটু হাসির আভাসের মত দেখা গেল, ঐ মুড়ি ভেজে। একটু থেমে বললে, দরকার হ'লে কামার-মা দেন, আর অন্য কাজও করি—পাড়ার লোকের চাল কড়াই ভাজি, বাছি।

অজিতের চোখ তোলবার ক্ষমতা ছিল না। সুবালার শ্রান্ত উদাসীন চোখ দুটি তার পানে চেয়ে ছিল। অবশেষে বললে, তবে তুমি শুধু খরচের টাকাই আমার কাছে নাও।

না। আমার আর আশাও নেই, নেশাও নেই, কোন রকমে সোজা এই পথেই শেষ খুঁজে নিতে দাও।—সুবালা মৃদু দৃঢ় স্বরে বললে। আমার অচল আর হবে না। আর—আর তুমি এস না।—সুবালা উঠে দাঁড়াল।

অজিতও উঠল হতাশভাবে, গভীর দুঃখ-ভরা দৃষ্টিতে সে সুবালার দিকে চেয়ে রইল।

সে নত হয়ে প্রণাম করলে, শুধু বললে, ভালর জন্যেই বলছি, আর এলে আমাকে উঠে যেতে হবে।

সে আর মুখ তুললে না।

স্ত্রীধন

অঙ্গনে শ্রাবণধারার ঝমঝম শব্দের বিরাম নেই। বেলা যে কতটা কিছুই বোঝা যায় না, পূব-পশ্চিম সমান অন্ধকার; দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা যে কোনও সময় হতে পারে—মনে হচ্ছে।

দালানে, ঘরেও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মল-পায়ে ঝমঝম ক'রে বেড়াচ্ছে। কান্নার কোলাহলে, ভূরিভোজনের আয়োজনে, ধারাবর্ষণে বাড়ি মুখরিত।

ফুলের মালায় খোঁপা জড়ানো, হাতের কাজললতাখানি কখনও মাথায় গোঁজা, কখনও হাতে, উপবাসক্লিষ্ট কোমল মুখখানিতে চন্দন-তিলক আঁকা, একটি ঘরের এক কোণে কনে ব'সে আছে। আশেপাশে সম-অসম-বয়সী সখীরা দিদিরা বধূরা নানাবিধ কথায় চর্চ্চায় মশগুল। বেশির ভাগই আপনার আপনার বিয়ে, বিয়ের দিনের কথা—কি রকম গোলমাল, বিষ্টি পড়া, কত রাত্রে লগ্ন, কি ভীষণ ঘুম পাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটু বড় জনকতক এলেন।

খাওয়া হ'ল তোমাদের দিদি?

দিদি মাথা নাড়লেন। বোঝা গেল বেলা তিনটে পার হয়ে গেছে।

কি কি দেওয়া হ'ল রে সুকু? সবই কি প'রে আছে?—দিদি-সম্বোধিতা, একটি কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

সুকুমারী বললে, না, রাত্তিরে পরানো হবে, এখনও সব পরানো হয় নি; আমি জানি না সব কি কি।

তোরা কে কি দিলি?—আর একজন প্রশ্ন করলেন।

বছর দেড়েক আগে মাত্র বিয়ে হয়েছে। সুকুমারী ভাবনায় পড়ল। আলাদা কিছু দিতে হয়, সে তো জানে না, সে জানে কুটুম্বরাই দেন। দিদিদেরও দিতে হয়?

অপ্রস্তুতভাবে বললে, জানি না তো।

কথার স্রোত অন্য দিকে বইল, সুকুর বিয়েতে অনেক খরচপত্র হ'ল কিনা, জ্যেঠামশায়ের রাগ হ'ল।—দিদি বললেন একজনকে। কনে, কনের দিদি সুকুমারী যেন নেই সেখানে।

তাইতে বুঝি সুনীতির গয়না কম কম হ'ল?—অপরা জিজ্ঞাসা করলেন।

হবেই তো। ওকে যে বেশ ভাল ঘরে দিলেন, প্রথম মেয়েটি। মানুষ আর কি বারে বারে পারে? দেখি রে তোর চুড়িটা?

দিদি সুকুমারীর হাতখানি টেনে নিলেন, চমৎকার দুগাছি চুড় অর্থাৎ একটু চওড়া চুড়ি।

কে দিয়েছে? শাশুড়ী?

না, বাবাই তো দিয়েছিলেন।—সুকু জবাব দিলে।

সকলেরই চোখ কনের মণিবন্ধে পড়ল, কনেরও চোখ দিদির চুড়ির দিকে পড়ল। কনের হাতে সোনার সরু সরু চুড়ি কগাছা ক'রে।

সবাই চুপ ক'রেই রইল। আবার অন্য পথে কথা চলল।

বাপ রে, কি বিষ্টি নেমেছে! বলে, ধারাশ্রাবণ, ঠিক তাই। আজকেও দেখছি, কাঁথা-চাদর কিছু শুকোবে না, কি ক'রে যে শোবে সব!

সকালবেলা বর-কনে-আশীর্ব্বাদের সময় দেখা গেল, সুকু তার চুড় দুগাছি বোনকে দিলে।

সঙ্গিনী একজন জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁরে ওটা দিলি যে? শাশুড়ী জানেন? বলেছেন?

ওটা ওর ভারী পছন্দ। আর—শাশুড়ী আর কি বলবেন? সুকুমারী *নতমুখী কনের স্বল্পাভরণ অঙ্গের দিকে চেয়ে ছিল।*

হ্যাঁগা বউমা, তোমার দুগাছা চুড় দেখছি না, তোমার বাবা যে দিয়েছিলেন সেই? ফেলে এসেছ? মাকে চিঠি লিখে দাও। কি অসাবধান বাছা! শাশুড়ী বধূর গহনা লোহার সিন্দুকে তুলছিলেন।

বধূ অপ্রতিভ মুখে এসে দাঁড়াল, সেটা মা, সুনীতিকে আশীর্ব্বাদ করেছি।

অবাক!—ব'লে শাশুড়ী আধমিনিট চুপ ক'রে রইলেন। অবাক হবারই কথা।

বলা নেই কওয়া নেই, দিয়ে দিলে? আমাকে একবার বলতে হয়, মরি নি তো! আর, কেমন আক্কেলই বা তোমার মার, তোমার জিনিস নিয়ে দিয়ে দেয়?

বধূও অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল, তার জিনিস হ'লেই বুঝি সে দিয়ে দিতে পারে।

আমি তো জানতুম না মা, আমি ভেবেছিলাম, ওটা তো—আমারই—

বাধা দিয়ে শাশুড়ী বললেন, আমারই হ'লই বা। তোমারই ব'লে কি বড়দের একটি জিজ্ঞেসাবাদ নেই? তা না হয় তুমি জান না, ছেলেমানুষ, তোমার মা-বাপেরও তো একটা বিবেচনা আছে!

মা তো জানেন না, মা।—অতি মৃদু স্বরে বধূ বললে। তার প্রায় চোখ ভ'রে এসেছিল।

হ্যাঁ, মা জানে না! তোমার বাছা সবতাতে জবাবটি দেওয়া চাই। শাশুড়ীর অনেক বিরক্তিতে মনে মনে নানাবিধ কথা উঠছিল—এই বে-আক্কেলে নেকামি আস্পদ্দা গোছের।

কি মা?—ননদ এসে দাঁড়ালেন।

যথা-প্রথা সমালোচনা-আলোচনা হ'ল। মা পাঠালেন ছেলেকে, সব কথা ব'লে বিহিত করতে।

বিহিত হ'ল। সুকুর বাবা এলেন, হাতে দুগাছা নতুন সেই গড়নের চুড়।

শাশুড়ী বললেন, হ্যাঁ, তাই তো, উনি হলেন গিয়ে জ্ঞানমান ব্যক্তি। তুলে রাখ এখন তোমার কাছে।

ঘরে এসে ছলছল চোখে মেয়ে বললে, বাবা, আবার কিনলে? ও যে আমার ছিল, তুমিই দিয়েছিলে।

বাপ হেসে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, পাগলী, হ'লই বা তোর, এদের না জিজ্ঞেস ক'রে হ'ল কিনা—

মানে বুঝতে পারা যায় না, মেয়ে চুপ ক'রে রইল একটুখানি। কিন্তু এ তো ওঁদের দেওয়া নয় বাবা, আর আমার জিনিস আমি কাউকে দিতে পাব না? চোখ ছাপিয়ে উঠল। তবে আর শুধু প'রে কি হবে?

বাপ তেমনই হেসে মেয়ের মাথায় মৃদু মৃদু আঘাত করতে লাগলেন, এই রকম করতে হয় মা, তুমি ছেলেমানুষ, জান না।

বাপের সার্থক ঘরে দেওয়া হয়েছিল। যাকে বলে, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী থাকা। সুকুমারীর গহনার পর গহনা, কাপড়-চোপড়, বাড়ি-ঘর, গাড়ি-ঘোড়া, ঐশ্বর্য্য, তিন ছেলে, এক মেয়ে।

অনেকেরই ঈর্ষার ভাগ্য।

মেয়ের আর তুটি ছেলের বিবাহ হয়েছে।

সুকুমারী সিন্দুক খোলেন, সব জিনিস নাড়াচাড়া করেন, গোছগাছ করেন। ভেতরে বাইরে সব জমজম করছে।

সুনীতির পর যাদের বিয়ে হয়েছে, শাশুড়ী স্বামী তাদের মাকড়ি কিনে দিয়েছেন, আংটি কিনে দিয়েছেন, কখনও বা মাথার ফুল-কাঁটা দিয়েছেন। মনের কোনখানে কখনও বেজেছে; কিন্তু সব অভ্যেসেই কড়া পড়ে তো।

কিন্তু যাই হোক, ঘর-কন্না তার, স্বামী-পুত্র তার, ঐশ্বর্য্য—ঐশ্বর্য্যের যদি আনন্দ থাকে, গর্ব্ব থাকে, সব তার;—মুষ্টিভিক্ষের চাল থেকে লোহার সিন্দুকের চাবি তার।

সুতরাং পুরোনো কথা ভাববার অবসর নেই, বেদনাবোধও নেই।

চাল সে যত ইচ্ছে খরচ করতে পারে, তারই তো! টাকাও সে খরচ করে, তা পাঁচ থেকে পনরো কুড়ি টাকা অবধি নিজেই খরচ করতে পারে; তারপরে অবিশ্যি জিজ্ঞেস করতে হয়, কিন্তু তারই তো! আর কারুর তো নয়!

অবসরহীন দিন। ডায়ার্কি-প্রণালীতে সংসার চলে; দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনায় সমস্তক্ষণ নিযুক্ত থাকতে হয়; ষোলআনা ভার। স্বামী অবধি মাঝে মাঝে পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন, ছেলেরা সুবিনীত।

লোকজন চাকর-ঝি, স্বজন-কুটুম্ব, দান-ধ্যান, গৃহিণীপনাতে নিরবসর দিন কাটে।

ভাই-বোনদের কখনও মনে পড়ে, কখনও পড়ে না। মাঝে মাঝে বাপকে মনে পড়ে—মধুর আনন্দে, নির্ম্মল কৃতজ্ঞতায়। ক্ষোভের অবসর নেই। সরল গর্ব্বে আনন্দময় হয়ে দেখে। তারই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাপ দেখেছেন, স্বামী দেখছেন, ছেলেরা দেখে।

চাকাটা অন্য দিকে ঘুরল। কর্ত্তা গেলেন। সুকুমারীর শরীর-মন ভেঙে পড়ল।

কালের নিয়মেই, ভাঙা শরীরে সুকুমারী আবার ওঠেন।

কিন্তু জাগে অনেক। তবে মন মায়ার বশ, ভুলেও যায় সব।

পশ্চিমের দিকে সুকুমারীর আয়ুর চাকা ঘোরে। ছেলেরা এসে কাছে বসলে মাঝে মাঝে বলেন, বাবা, শরীর তো বড় খারাপ, এইবার তোমাদের সব ভাগ-যোগ ক'রে দিই।

ছেলেরা বলে, তাড়া কেন মা?

ছেলেরা কিন্তু ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেয়েছে।

বউদের ভোট দেবার অধিকার, অর্থাৎ ঝি-চাকর ছাড়াবার রাখবার ক্ষমতা।

বউয়েরা নিমন্ত্রণ যাবে, শাশুড়ীর শোবার ঘরে এসে দাঁড়াল, শাশুড়ী চাবি দিলেন।

সিন্দুক খুলে দুই বউয়ে গহনা নিতে বসল।

ভাই, দেখ, মার চুড়িগুলো কি চমৎকার!

মেজবউ বললে, কে বলবে সেকেলে গড়ন, যেন ঠিক এখনকার মতন। আমি সেদিন জষ্টিস মিত্তিরের বউয়ের হাতে দেখেছিলাম।

মেজবউয়ের বাপ বেশ বড় উকিল।

মার কানে গেল, বললেন, তা তোমরা পর না বাছা, যার যা ইচ্ছে হয়। সীতাহারটি মেজবউমা পর। বড়বউমা, চুড়ি দুগাছা পর। আর ওপর-হাতের তাবিজ আর বাঁক, দুজনে দুজোড়া পর।

তোমার সব গয়নাই কিন্তু মা বেশ শৌখিন, একেলে ধরনের।— বড়বউ বললে।

মেজবউ বললে, মা, তোমার সব গয়নাই কি বাবা দিয়েছিলেন তোমায়? এই সব চুড়ি, মুক্তোর মালা?

না, চুড়িজোড়াটা আমার বাবা দিয়েছিলেন। তিনি খুব সূক্ষ্ম পছন্দর লোক ছিলেন। কোন্ বিলিতী দোকান থেকে করিয়ে এনেছিলেন। আরও অনেক গয়নাই দিয়েছিলেন তিনি। আর কতক আমার শ্বশুর, কতক তোমার শ্বশুরও দিয়েছিলেন এদানি। মুক্তোর হার-ছড়াটি আমার শ্বশুর আশীর্ব্বাদ করেছিলেন।

অতীতের সুখের ছায়াপথে মন একবার থমকে দাঁড়াল।

সুনীতিকে চুড় দেওয়া, তাই নিয়ে কথা শোনা, বাপের কথা; তারপরে শত শত জায়গায় যাওয়া-আসা; বসনভূষণের, শ্রী-গড়নের প্রশংসালাভ। কৃতজ্ঞ, ব্যথিত আনন্দে মা-বাবাকে মনে পড়ল, স্বামীর কথা মনে হ'ল।

বউয়েরা নিমন্ত্রণে চ'লে গেল।

গহনাসূত্রে অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল।

সন্ধ্যের পর ছেলেরা এসে মার কাছ বসল। মার মনে হ'ল, আর দেরি ক'রে কি হবে? ইচ্ছেটা প্রকাশ করলেন।

বড় বললে, তোমার কি নেহাৎ ইচ্ছে? তা হ'লে হোক।

বাড়ির ভাগ, বাসনের ভাগ, চুল চিরে কড়াক্রান্তি ক'রে হয়। পেতল, কাঁসা, তামা, লোহার বাসনই কি কম? আট সিন্দুক বাসন-কোসন—দোল-দুর্গোৎসব সবই আছে। রূপার বাসনই এক সিন্দুক—বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতে-ক্রিয়াকাণ্ডে সব বেরোয়।

তবু মা কি ভাবেন কেবলই। শেষে একদিন জপের পর রুগ্ন দেহে বারান্দায় ব'সে ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল, আর দেরি করা নয়।

ছেলেরা এল।

মা বললেন, দেখ বাবা, সব তো করলাম, এইবার আমার দুচারখানা যা গয়না আছে আর কিছু নগদ টাকা আছে, তার ভাগ করলেই নিশ্চিন্ত হই।

কি রকম ভাগ করতে চান? ছেলেরা চুপ ক'রেই রইল।

বলতে আর পারেন না, ইতস্তত ক'রে শেষে বললেন, সরিকে ভাল ঘরে দিতে পারি নি, তেমন কিছুই ওর নেই, আমার নগদ টাকাকটি আর গয়নার অর্দ্ধেক ভাবছি তাকে দিই, আর যা থাকবে বাকি, তা থেকে শৈলেনের বউয়ের জন্যে, আর কিছু কিছু এ বউমাদের থাক। এইটি হ'লেই নিশ্চিন্ত হই।

খানিকক্ষণ ছেলেরা চুপ ক'রে রইল।

বড় ছেলে খানিক পরে বললে, শৈলর বিয়ে হ'লে বউমাকে দিতে হবে বইকি, তা তো সত্যি; কিন্তু সরিকে আবার কি দেবার দরকার? তার কি বিয়ে দাও নি? আর সে সময় তো খুবই দিয়েছিলে। সরিকে দেবার কোন মানে আমি খুঁজে পাই না।

মা সঙ্কুচিতভাবে বললেন, ওর বিয়ের সময় তিনি খুব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ওরা যে নিতান্ত গেরস্থঘর কিনা, আর স্ত্রীধন তো দেওয়া যায় মেয়েকে, তাই—তাই ভাবছিলাম—

ছোট ছেলে বেড়িয়ে ফিরল, সে এসে বসল মার কাছে।

ঈষৎ উচ্চ স্বরে বড় ছেলে বললে, গেরস্থ আর কি! আর স্ত্রীধন ব'লে তো বিলিয়ে দিতে পার না? টাকা কিছু দিতে চাও দাও, তাই ব'লে ওটা আমার মনে হয় না। আর এরাও কি তোমার মেয়ের মতন না?

মা লজ্জায় অপ্রস্তুতে পড়লেন। তা এদের তো সবই রইল বাবা। তোমরা বেঁচে থাক, কত আনবে, দেবে, তোমাদের বাড়ি-ঘর টাকাকড়িও তিনি ক'রে গেছেন, অভাব নেই।

উষ্ণভাবে বড় ছেলে বললে, ওকে কি সৎপাত্রে দাও নি? পয়সা কপালে করে। আজ যদি কিছু ভালমন্দ হয় ওর, আমাদেরই তো দেখতে শুনতে হবে।

ষাট ষাট, ও কি কথা বাবা!

অপ্রস্তুত হয়ে বড় ছেলে বললে, সে কথা বলছি না আমি। কিন্তু আমাদের ভালমন্দ হ'লেও তো ও দেখবে না।

বালাই, কি বলিস সব!

কথা কেমন থেমে গেল। মনের ভেতর তার নানা অঙ্কুর বেরোতে লাগল। কিন্তু সকলেই চুপ ক'রে রইল। মারও শ্রান্তি বোধ হচ্ছিল, চোখ বুজে চুপ ক'রে রইলেন, বধূকালের স্নীতিকে চুড় দেওয়ার কথা মনে পড়ল একবার।

তা মেজবউ, যাই বল তুমি, এ মার ঠিক হয় নি কিন্তু।

সকালবেলা ভাঁড়ার-ঘরে দুই জায়ে কথা হচ্ছিল।

কিন্তু আমি ভাই শুনেছি বাবার কাছে, এ রকম নিয়ম আছে।

মেজবউয়ের বাপও উকিল, মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর শখও ছিল।

তা হতে পারে, কিন্তু দেওয়া তো ঠাকুরঝিকে কম হয় নি। উনি তো বংশছাড়াই গোত্রছাড়াই হলেন। মেয়ে তো হাজার হোক। কোন্ কাজে উনি লাগবেন? দিলেই তো সব পরে পরে গেল। বিয়েতে হাজার বারো তেরো বাবা খরচ করেছিলেন, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-পড়া ছেলে ব'লে।

মেজবউয়ের মনে ছবির মতন বাড়ি-গাড়ি-মোটর-ঐশ্বর্য্যময় শ্বশুর-বাড়ির চিত্র ভেসে গেল, সে কিছু আর বললে না। মনে হ'ল, আমাদেরও তো দিয়েছিলেন, আর রইলও তো সবই।

বড়বউ বললে, আমাদের বাপ তো আমাদের দেন নি বাপু ছেলেকে বঞ্চিত ক'রে। এ উচিত নয়।

মেজবউ চুপ ক'রেই রইল। এবং উচিত কথা বলাও উচিত নয়, সর্ব্বত্র সত্যি কথা বলা যায় না।

যাই হোক, ভাগ হ'ল।

মার রোগশয্যার পাশে লোহার সিন্দুক উজাড় ক'রে গহনা পড়ল।

কন্যাকাল, বধূকাল, কিশোরীকাল, তারপর সমস্ত জীবনের নানাবিধ গড়নের নানা রকমের ছোট বড় অজস্র গহনা—মুকুট, সিঁথি, টায়রা, কপালপাটি, ঝাপটা, কান, ইয়ারিং, মাকড়ি, কানবালা, ফুলকাঁটা, চিরুনি, সাতনর, সীতাহার, নেক্‌লেস, চিক, দড়িহার, গোটহার, বিছেহার, মুক্তোর মালা, কলার, তাবিজ, বাঁক, অনন্ত, জসম, বাজু, রুলি, বালা, ব্রেস্‌লেট, চুড়, মুক্তোর চুড়ি, সোনার চুড়ি, রতনচুড়, আংটি, তারপর গোট, চন্দ্রহার ইত্যাদি সব কত কি ছোট-বড় স্তূপাকারে পড়ল রূপোর থালায়। তিনখানা থালায় ভাগ হতে লাগল।

তিন ভাগ হ'ল—বড়, মেজ, শৈলেনের ;—সব ভাগের পর সরযুর জন্য রাখা হবে কিছু।

ভালমন্দ—সেই অকল্যাণের কথার পর মা আর কিছু বলেন নি, আজও বললেন না। যুক্তি-বিচার-তর্কের অবকাশ মনে নেই—শুধু শ্রান্তিভরে চুপ ক'রে দেখতে লাগলেন।

মেজ আর বড়র ছেলে-মেয়েরা সব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। তা হ'লে মা, এই অনন্ত, গোট, রুলি আর দড়িহার রইল সরির? জিজ্ঞাসু চোখে ছেলেরা মার পানে চাইলেন, ভারী আছে—ওজন কম নয়।

ঝিয়ের মতন অনন্ত !

মা ফিরে দেখলেন। বললেন, আচ্ছা।

শুধু মনে হ'ল, শাঁখা-সিঁদুর প'রে মনের তৃপ্তিতে সে থাক; দিয়ে কে কাকে সমৃদ্ধ করতে পারে ?

ছেলেরা তৃপ্ত মনে কথা কইছিল। মার হ'ল গিয়ে মেয়েলী বুদ্ধি; যা সম্ভব তাই করা উচিত ;—এই সব ধরনের কথা মনে উঠছিল। কথাও সেই ভাবের—যেন স্পষ্ট নয়। মার বুদ্ধিকে ছোট করা হ'ল; মাকে কি—মেয়েমানুষের কবে বিষয়বুদ্ধি থাকে !

বউয়েরা অবগুণ্ঠন টেনে দরজার কাছে ব'সে ছিল।

বড়বউ উঠে দাঁড়াল, রান্নাঘরে ঠাকুর ডাকাডাকি করছে, মার পথ্য তৈরি করতে হবে।

সুকুমারী বললেন, তোমরা তুলে ফেল মা এবার এই সব। বউয়ের মেয়ে বললে, এসব আমি নোব মা। একটা মস্ত চন্দ্রহার সে গলায় প'রে মার সঙ্গে উঠল, আজকে সে সেইটে প'রে থাকবে। তুমি পাবে না, সুরো পাবে না।

সস্নেহে বাপ একটু হাসলে, বললে, আচ্ছা, তুমিই নিও সব। এই বয়েসে বেটী গয়না চিনেছে দেখেছ মা ?

শাশুড়ী বললে, ওগো বউমা, ওকে একটা হার পরিয়ে দাও। চন্দ্রহার পরেছে গলায়।

বাপ হাসলে, মেয়ের হাত ধ'রে বাইরে উঠে গেল। মেজ ছেলেও উঠল।

সুকুমারী মেজবউকে ডেকে বললেন, ও বউমা, তোমার তোল। মেজবউয়েরও কাজ প'ড়ে ছিল—শাশুড়ীর পূজোর যোগাড় করা, কাপড় ছাড়ানো, শরবৎ ক'রে দেওয়া।—এসে দাঁড়াল।

তুলতে একটু ইতস্তত করতে লাগল ; তার পেলে ক্ষতি নেই, না পেলে বিরক্তি নেই, এই বোধ হয় ভাবটা।

ছোট ছেলে মার জন্যে ওষুধ ঠিক করছিল ; বললে, মেজবউ, মাকে জল এনে দাও তো।

মা বললেন, তোরটা কোথায় রাখবি ? বউমারা তুলবেন ?

মেজবউ জল আনতে গিয়েছিল।

এবার ছেলে বললে, আমার থেকে আদ্দেক সরিকে দাও না মা ?

মার চোখ থেকে টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগল।

একটু থেমে বললেন, তুমিই দাও বাবা, ও তো তোমারই দেওয়া। আর নাই বা দিলে, দেওয়া তো হয়েছেও, হ'লও।

কই ?

মেজবউ জল নিয়ে এল।

ওষুধটা খাও এবার।—ছেলে বললে।

দাঁড়া, কাপড় ছাড়ি, পূজো করি।—মা উঠল।

কি হে, হঠাৎ যে ! সরযূর স্বামী গিরীন্দ্র ঘরে ঢুকে কনিষ্ঠ শ্যালককে দেখে বললে, মা ভাল তো ?

শৈলেন বললে, এমনই, আপনার তো ছুটির দিনও দেখা পাওয়া দুর্লভ। মার অসুখটা কম আছে, সরিকে দেখতে এসেছিলাম।

সময় কোথায় হে ? একজামিনের পেপার নিয়ে পড়ছি যে।—ভগ্নীপতি বললে। শৈলেন খানিক গল্প ক'রে চ'লে গেল।

টেবিলের ওপর স্তূপাকার খাতাপত্র। গিরীন্দ্র একমনে কাজ করছে।

ছেলের দুধের বাটি, পানের ডিবে, বিস্কুট, বাতাসা, ঝিনুক ইত্যাদি নানাবিধ নৈশ জিনিসে হাত ভরিয়ে সরযূবালা ঘরে ঢুকল।

তবেই হয়েছে, ঐ কাজ নিয়ে পড়েছ!—স্ত্রী টীকা করলে।

স্বামী অন্যমনে বললে, হুঁ, তারপর?

তারপর আবার কিসের?—সরযূ বললে।

এই যে তুমি কি বললে না?—স্বামী মুখ তুললে।

সরযূ হেসে বললে, কিন্তু আজ শোনবার মতন কথা আছে। আজ ছোড়দা এসেছিল। গহনাভাগের সমস্ত পালা ব'লে সরযূ মৃদু হেসে বললে, তাই মা বলেছিলেন সরিকে গেরস্তঘরে দিয়েছি। সকৌতুকে স্বামীর মুখের দিকে চাইলে।

তারপর?—স্বামীও কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করলে।

তাই ছোড়দা সব গল্প করছিল, আর আমার কি কি ছিল দিয়ে গেল।

সত্যি? তা হ'লে আজ কিছু লাভ হয়েছে বল তোমার! সকালে মুখ দেখেছ কার? বিশ্বাস তো কর না। দেখলে আমার চেহারার 'পয়'?

আহা, তা হ'লে তো রোজই পাওয়া উচিত।

ঝিনুক-বাটির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে খোকাকে স-কোলাহলে দুগ্ধপান-নিরত স্ত্রীর পানে চেয়ে বললে, কিন্তু গেরস্তদের বউ আজ গরিব গেরস্তকে পান দিতে ভুলে গেছে।

ওমা দেখেছ, একেবারে ভুলে গেছি। দিই। ছেলেকে শুইয়ে হাত ধুয়ে সরযূ পান নিয়ে স্বামীর চেয়ারের পাশে দাঁড়াল। স্বামী পানসুদ্ধ তার ডান হাতখানা নিজের বাঁ হাতে মুঠো ক'রে ধ'রে নিলে, তা হ'লে গেরস্তঘরে প'ড়ে সরোর কিন্তু বড় দুঃখ, না?

যাও, কি যে কথার ছিরি! নাও পানটা। সরযূ টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে খাতার বহর দেখছিল, আজ আর খাতা দেখতে হবে না।

কেন বল তো? অনেক কাজ আছে যে! স্বামী হাসলে।

রোজ রোজ কি কাজ, পোড়া কপাল ছুটির!

স্বামী অন্যমনে তার দিকে চেয়ে ছিল, মুঠোটা ছেড়ে পান খাবার কিংবা কাজ করবার কোন আগ্রহই তাঁর মুখে দেখা যাচ্ছিল না।

সরযূর বাপের বাড়ির সংসারের কাজ সারা হ'ল।

ছেলেপিলে, অসুখ-বিসুখ, ঝি-চাকর, দরোয়ান-কোচম্যান সব সমস্যা আলোচনা হয়ে থামল।

বড়বউ বললেন, ঠাকুরপো তার ভাগ থেকে আদ্দেক ঠাকুরঝিকে দিয়ে এসেছে, জান?

নগেন বললে, বটে? না তো।

তা মার যে সব উল্টো ছিষ্টি, একবার তো বাপু দেওয়া হয়েছে!

নগেন শুধু 'হ্যাঁ' বললে, আর কথা কইলে না। ফেনিয়ে অকারণে কথা কওয়া তার স্বভাব নয়—বিশেষ ক'রে মার বিষয়ে। মার বুদ্ধিতে তার খুব শ্রদ্ধা না থাকতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে সেটা আলোচনা করা!—

মেজবউ বললে, কিন্তু যাই বল, এটা তোমাদের ভাল কাজ হয় নি, হকের হিসেবে; আর মা তো আদ্দেকই দিতে বলেছিলেন, তোমাদের তো সব রইল।

কাগজ পড়তে পড়তে বরেন বললে, হুঁ।

বাবা বলেন—

মেজবউ আর দু একটা কি বলতে গেল, উত্তর পেলে না, রাগ ক'রে শুয়ে পড়ল।

সুকুমারীর পথের যখন হিসাবমতন মাইল কতক পথ আছে, আর মাস ছয়েক হয়তো সময় আছে; হঠাৎ খবর এল, সরযূর ভাগ্য ভালমন্দের মন্দটা বেছে নিয়েছে।

মাইল এসে গজ কতকে ঠেকল, ছ মাস এক মাসে দাঁড়াল; সেই যে মা মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লেন, আর সোজা হয়ে দাঁড়ালেনও না, ফিরেও চাইলেন না।

শাঁখা-সিঁদুর-সমৃদ্ধির পাশবন্ধন কাটিয়ে সরযূ মুক্ত হয়ে জগৎ-মিথ্যার পথে এসে দাঁড়াল।

বছর কতক কেটেছে—ইতিমধ্যে শৈলেনের বিয়ে হয়েছে, একটি ছেলেও হয়েছে।

সরযূ বেশির ভাগই এখানে থাকে। একটি মাত্র ছেলে—বছর সাতেকের।

সন্ধ্যার পর বউয়েদের কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, তার জন্যে তারা ঘরের ভেতর ব্যস্ত।

সরযূ ছোট ভাইয়ের ছেলেকে কোলে নিয়ে বারান্দায় ব'সে ছিল।

ছোটবউয়ের প্রসাধন হ'ল।

ওমা, তুই হাতে শুধু ঐ প'রে যাবি?—বড়বউ নিজের হাতে কি একটা গহনা পরতে পরতে বললে।

মেজরও হয়েছিল, সেও চেয়ে দেখলে, তাই তো, ছোটবউয়ের ও কি আজ হ'ল? হাতটা যে নেড়া মনে হচ্ছে! তোমার হাতের আর কিছু নেই?

ছোটবউ জায়েদের হাতের আর গলার আধুনিক অলঙ্কারের দিকে চেয়ে ছিল, তাদের তুলনায় ওর নিতান্ত আষ্টিকেলে গহনা।

হোকগে ভাই, হবে ’খন এতেই।—সে বললে।

মেজবউ বললে, না, কেমন সং দেখাবে, না বড়দি? আমরা বড়রা এত প’রে যাব—

মাথার ঘোমটা ঠিক করতে করতে বড়বউ আরশির দিকে চেয়ে বললে, হুঁ, দেখি আমাদের আর কি আছে?

সুবিধেমতন কিছু পাওয়া গেল না নিজেদের বাক্সে।

হ্যাঁ ভাই, তোমাদের হ’ল? রাত হ’ল যে! সরযূ এসে দাঁড়াল। বেশ হয়েছে। কই ছোটবউ, দেখি।

ছোটবউয়ের তেমন সুবিধেমতন কিছু পাওয়া গেল না।—বড়বউ বললে।

সরযূ বললে, আমার কিছু দোব? এস তো দেখি।

গলার আর হাতের কি দুটো দিয়ে সম্পূর্ণ হ’ল। ওরা চ’লে গেল।

অন্ধকার বারান্দায় সে খোকাকে ঘুম পাড়াতে বসল। অন্ধকারভরা বাগান, আকাশে কৃষ্ণপক্ষের তারা। ‘আয় ঘুম, যায় ঘুম, বাগ্দী-পাড়া দিয়ে,’ খোকার জন্যে ‘একশো টাকার মলমলি-থান সোনার চাদর’ কিনে দিয়ে ঘুম এল।

অনেক রাত্রে তারা এল ফিরে, খোকার পিসীমা তখন শুয়ে পড়েছে। বারবার ডাকায় কিন্তু ঘুম আজ বোধ হয় তার ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন, তাই তার কাছে আর এলেন না।

বারান্দার এক দিকে মাদুরে সে শুয়ে ছিল।

শৈলেন তখন বই পড়ছিল। সুসজ্জিতা পত্নীকে দেখে একটু পরিহাসের হাসিভরা দৃষ্টিতে সে চাইলে।

পতিব্রতা স্ত্রীরা সেকালে শুনেছি স্বামীর জন্যই সাজতেন, একেলে পতিপ্রাণারা নিমন্ত্রণবাড়ির সখীদের জন্য সাজেন।

হ্যাঁগো!—টেবিলের ওপর অলঙ্কারের স্তূপ জমা হচ্ছিল। আচ্ছা, এই চুড়িদুটো কি মার?—প্রশ্ন করলে।

কোন্‌টি?—শৈলেন বললে।

ছোটবউ হাতে তুলে দিলে স্বামীর।

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, এটা মারই ছিল—কোথায় পেলে?

ঠাকুরঝি দিলেন পরতে। তাই দিদিরা বলছিলেন।

কি বলেছিলেন?

ওঁরা বললেন, মা তো ওটা তোর জন্যেই রেখেছিলেন, ঠাকুরঝির কাছে কবে গেল?

শৈলেন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললে, মার ইচ্ছে হয়েছিল, সরো তাঁর সব জিনিস না হোক খানিকটা পায়। যাক, সেটা হ'ল না যখন, তখন আমি আমার ভাগের থেকে অর্দ্ধেক সরোকে দিয়ে এসেছিলাম মার মত নিয়ে। ও মার মেয়েই।

আমি কি বলছি কিছু? দিদিরা বললেন, ঠাকুরঝিকে তো বিয়ের সময় কম কিছু দেওয়া হয় নি, আর ওঁর দরকারই বা কি এখন গয়নার? ছোটবউ মুক্তোর মালাটাও খুলে রাখলে। ওঁরা বললেন, হিসেবমতন মা ওটা তোর জন্যেই রেখেছিলেন।

তোমরা সব কি কথা কও!—ব'লে শৈলেন উঠে গেল। সুসজ্জিতা স্ত্রীর রাত্রির সমস্ত মাধুর্য্য ঝ'রে প'ড়ে যেন একটা হাড়-বের-করা সঙ্কীর্ণ লোলুপতা সুমুখে এসে দাঁড়াল।

সরযুর কানে পৌঁছল খানিক। মনে হ'ল, একবার উঠে কোথাও স'রে যায়, কিন্তু শৈলেনের বিরক্ত মুখের কথা পাশের ঘরে তার কানে পৌঁছল।

এত ইতিহাস সে জানত না। বহুদিন আগের সেই সন্ধ্যা মনে পড়ল।

গহনার দুঃখ আর কি হবে? হাসি এল একটু, কিন্তু পরক্ষণেই চোখ ভ'রে উঠল।

সমস্ত রাত্রি কি অন্যমনে, নির্ব্বাক অদ্ভুত জটিল বেদনায় কেটে গেল, ঘুম আর আসে না।

শেষরাত্রে, তখন ভোরের পূব-আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে, বারান্দার মাদুরে—ঘুম এল। ছেলে ঘরে ঘুমোচ্ছে।

শৈলেন ডাকলে, সরো, এখানে যে? এত বেলা?

সরোর ঘুম ভেঙে গেল। ভোরের স্বপ্নটা কোথায় পথ হারিয়ে ফেললে, অপ্রস্তুত হয়ে সে উঠে বসল।

শৈলেন একটু আশ্চর্য্যভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। সমস্ত রাত্রির ব্যাকুল জাগরণক্লিষ্ট মনের ছাপ মুখে পড়েছে। মুখের হাসির পাশে মনের সাগরে অশ্রু টলমল করছে।

সন্ধ্যার সময় বারান্দায় সুপারি নিয়ে সরযূ ব'সে ছিল। স্বপ্নটা সারাদিন ধ'রে মনে আর আনতে পারছিল না। নিরভিমান মনে আর কোন কথা ছিল না।

ছোটবউ এসে দাঁড়াল, কি করছ ভাই?

জাঁতি আপনার কাজে মন দিলে, সুপারি কাটা হতে লাগল। কিছু না, ব'সে ছিলাম সুপুরিগুলো নিয়ে। সরযূ সোজা হয়ে বসল।

তোমার গয়নাগুলো নেবে? এখন তুলবে?—ছোটবউ দুটো গহনার কেস হাতে ক'রে জিজ্ঞেস করলে।

ননদ বললে, এগুলো তুমি রাখ না ছোটবউ, আমি তো তোমাকে কিছু দিই নি এমন।

সে কি ভাই?—সবিস্ময়ে ছোটবউ চেয়ে রইল ননদের দিকে।

ঠাকুরঝি কি ওদের আলোচনা জানতে পেরেছে? কি ক'রে জানল? কিন্তু কথা তো রাগ করবার মতন নয়, বেশ সহজই তো মনে হচ্ছে।

স্মিত হাস্যে সরযূ বললে, ভাবছ কেন, আমি তো দিতে পারি তোমাকে, বয়সে তোমার কত বড়, আর আমার কি হবে ওসব?

সে কি ভাই? তোমার নলিন বেঁচে থাক, তার বউ পরবে।

না রে পাগল, তখন তার মামারা দেবে।—সরযূ বললে। যাও, রেখে দাও।

ছোটবউ বিস্ময়ে আশ্চর্য্যে একেবারে ভ'রে গিয়েছিল, জায়েদের কাছে বলতে গেল সব কথা।

সরযূ হারানো স্বপ্নের খেই সকালের কাজের আড়ালে, দুপুরের স্তব্ধ অবসরে, এখন সন্ধ্যায় দৃষ্টিহীন অপরূপ অন্ধকারের বুকে ধ্যানের মধ্যেও খুঁজে পেলে না। অন্ধকার বারান্দায় ব'সে শুধু রাশীকৃত কাটা সুপারিতে পেতেটি ভ'রে উঠতে লাগল।

অমর

ছোট্ট গ্রামের, তারও চেয়ে ছোট অলেখা ইতিহাসে ক্ষণপ্রভা অমর হয়ে রইল।

অমর অবিশ্যি মানুষ অনেক রকমে—ধর্ম্ম, কীর্ত্তি, যশ, ধন সব দিয়েই হয়, আবার এমনিও হয়। ভোলে না তাকে অনেক দিন লোকে।

প্রতিদিনের জন্মমৃত্যুর কাহিনী মানুষের নিতান্ত নিজস্ব না হ'লে মনের পাতে আঁকা থাকে না। কিন্তু অসাধারণ হ'লে, নাই বা হ'ল সে স্বজন-বন্ধু আপনার জন, তাকে কাক-পক্ষীও ভোলে না।

ঘটনাটা হয়েছিল এই।—

ক্ষণপ্রভা যেকালে জন্মেছিল সেকাল থেকে তার বিয়ের সময় অবধি, সারদা-বিলকে ফাঁকি দিয়ে তার বিয়ে দেবার দরকার ছিল না; কেন না সারদা-বিল পাস হবার অনেক আগে তার বারো বছর ছিল। তার ওপর মেয়ে ছিল সুন্দরী, ক্ষণপ্রভার একটুখানি আলো তাকে ছুঁয়েছিল; আর বাপ ছিলেন বুদ্ধিমান, সুতরাং যেমন পাশের গাঁয়ে সুপাত্র দেখা, শুভকাজ সম্পন্ন করতে বিলম্ব করলেন না।

বারো বছরের বাড়ন্ত মেয়েটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে যখন সম্প্রদানের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হ'ল, সবাই তাকে আশ্চর্য্য হয়েই চেয়ে দেখলে।

বিয়ে, বর, বাসর, বাঁশি, আলোয় রাত্রি আনন্দে যেন ঝলমল করতে লাগল।

বুঝুক না বুঝুক, ক্ষণপ্রভার মনটিও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মেয়ে মাত্র ছিল এতদিন, এখন যেন একজন হয়ে উঠল হঠাৎ। গহনা-কাপড়ে

সাজানোর আদরে তাকে আট দিন ধ'রে সবাই এমন ঘিরে রাখলে, যেন হঠাৎ কোন্ সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে তার বালিকাকালের মনের মধ্যে আর একজন কে জেগে উঠল।

দিনের রাতের উৎসবের মাঝে তাকে তার ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয় সব্বাই সাজায়, সবাই খাওয়ায়—না পারলেও। সঙ্গিনীরা কেউবা একটু বড়, কেউবা সমান, সকলেই তার সঙ্গে সমানভাবে সমান মনে ক'রে কথা কয়, সে যেন সেদিন সকলের একজন। না হয়ে থাকে, হবে, হ'ল ব'লে।

শ্বশুরবাড়িতেও আহ্বান আসে। সেখানেও তাকে ছোট মনে করা হয় না, চার মাস আগে যে খেলাধুলোর ঘরে ছোট্ট মেয়ে ছিল, সে আজ তরুণীদলের রহস্যময় জীবনের চৌকাঠের ভেতর দিকে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাধারণ নিয়মমতই ক্ষণপ্রভা যাওয়া-আসা করে।

বছর দুই পরে নিজেরই অজানতে সে যখন অপরিণত বালিকা-মন নিয়ে যত্ন-আদরে পরিণত তনুদেহে তরুণ জীবনের পথে এগিয়ে দাঁড়িয়েছে, একদিন খবর এল তার বাপের বাড়িতে, ক্ষণপ্রভার বরের মৃত্যু হয়েছে।

ক্ষণপ্রভার মা বাপ প্রতিবেশী স্বজন সকলেই কাঁদলে।

ছেলের জন্যে যত কাঁদলে, তার চেয়ে ঢের বেশি, অনেক বেশি কাঁদলে মেয়ের জন্যে—মেয়ের অবুঝ বালিকা-বয়সের জন্যে, মেয়ের চিরদিনের কঠোর সামাজিক কৃচ্ছ্র তার জন্যে; মেয়ের প্রতিমার মতন রূপের জন্যে।

ছোট গ্রামখানির সকলের যেমন তার বিয়ের দিনে আনন্দের উৎসাহের শেষ ছিল না, তেমন সেদিন দুঃখেরও সীমা রইল না।

এইবারে আবার সাজানোর পালা আসে।

ব্যাকুল বেদনায় ভাবনায় স্বজনরা তার সাজ বদলায়। আলতা-সিঁদুরে

চেলী-বারাণসীতে সাজাবার সময়ও কেউ তার পরামর্শ নেয় নি, সবাই হেসেছিল, আনন্দ করেছিল, সেজেছিল, সাজিয়েছিল ; এদিনেও তার মতামত পরামর্শ কেউ জিজ্ঞাসা করলে না, মানলেও না। যথারীতি চিরকালের চিরবিধবা কোন এক গ্রাম্য বর্ষীয়সীকে দিয়ে তার সাজ বদলালে।

রঙিন শাড়ি-শেমিজের অনুকল্পে এল সাদা মাঝারি-পেড়ে শাড়ি, থান অবশ্য নয়। গহনাও রইল গলায় আর হাতে। আহারেও তাই। নানা অনুকল্পে বিকল্পে কঠোরতা-কৃচ্ছ্র তাকে সাময়িক লঘু ক'রে সকলে মিলে কেঁদে তাকে আবার সাজালে, দিনযাত্রার আমূল পরিবর্ত্তনের পথে এগিয়ে দিলে।

আর একদিন সে যেমন সকলের সঙ্গে হেসেছিল, এদিন সকলের সঙ্গে তেমনই ক'রেই কাঁদলে।

দুঃখের শোকের গুরুত্ব, বেদনা অবশ্য তার জানা ছিল না কিছুই।

তার কাছে তার নতুনের মধ্যে, তাকে না আসে কেউ সাজাতে। না আসে গল্প পরিহাস হাসি রহস্য করতে, সঙ্গিনীরা সব তাকে যেন এড়িয়ে চলে। মাও তাকে খেতে ডাকেন না তাদের সঙ্গে।

দিন গড়িয়ে গড়িয়ে চ'লে যায়।

ক্ষণপ্রভার মা-বাপের ক্রমশ সবই স'য়ে যায়।

ক্ষণপ্রভার বয়স ষোলোর শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে।

এলোচুলের গোছা জড়িয়ে সে খোঁপা ক'রে মাথায় রাখে, মাথায় যেন চুল ধরে না।

স্নান ক'রে সরু-পেড়ে শাড়িখানি প'রে আসে, অযত্নকে অবজ্ঞা করে, কৃচ্ছ্র তাকে যেন পরিহাসভরে অতিক্রম করে—তার সর্ব্বাঙ্গে রূপ যেন পুষ্পিত বিকশিত হয়ে উঠছে।

তার মনের খেলাঘরে সেই একদিনের হাসির উৎসবের খেলা সেই-দিনেই রয়ে গেছে, তারপর অন্য আর একদিনের কান্নার কোলাহলও সেইদিনের সীমাতেই থেমে গেছে, এদিনে আর তারা পৌছোয় নি ; তাই তার চোখে মালিন্য নেই, মুখে বেদনা নেই, শুধু কেমন এক কারুণ্য আছে, যেন বিস্ময়ও আছে।

যারা সকলে মিলে একদিন তাকে সাজিয়েছিল, তারা সবাই এখন ভাবে, কি ক'রে ওকে—ওর রূপকে—ওর শ্রীকে মাটি করা যায়, কি ক'রে ওর নব-পুষ্পিত তমুলতাকে শুকিয়ে দেওয়া যায়।

উৎসবের ঘরে যার আহ্বান আসে না, ডাক পড়ে না, তার সমস্ত দেহ ঘিরে অত উৎসব কেন ?

পাড়ার গৃহিণীরা বলেন, ক্ষণুর মা, তোমার ক্ষণুকে এবার 'বার-বেরতো' করাও। মেয়ের নিষ্ঠা হোক। নিষ্ঠে-কিষ্ঠে না হ'লে কি বিধবা-মানুষ মানায় ? আর ছেলেমানুষ ক'রে রেখো না।

মার কানে যেন লোহা-গলানো ঢেলে দেয় 'বিধবা' শোনায়। কিন্তু কি বা বলবেন !

এমনিতর সময়ে ক্ষণপ্রভাকে একদিন সকালে আর পাওয়া গেল না। গ্রাম একেবারে চুপ হয়ে গেল। সমস্ত কথা মনের ভেতর তোলপাড় করে সকলের—বাইরে আসবার পথ খুঁজে পায় না যেন। সঙ্গিনীরা ভাবে, ক্ষণু গেল ! ক্ষণু যাবে, এ তো মনেও হয় নি। কার সঙ্গে ? কি ক'রে ? কোথায় ? মনে মনে প্রশ্নের সীমা থাকে না, কিন্তু কেউ মুখে জিজ্ঞাসা করে না।

বর্ষীয়সীরা ভাবেন, মেয়েটা গেল কোথায় ? ডুবে মরে নি তো ?

কি হ'ল? বিশ্বাস হয় না অন্য কিছু যেন। তাঁরাও শুধু 'দুর্গা দুর্গা' ব'লে নিশ্বাস ফেলেন।

ক্ষণুর মা কি ভাবেন কে জানে; বাপও হয়তো ভাবেন কত কি—কেউ কাউকে বলেন না।

শুধু চিরবিধবা মাতঙ্গিনী-ঠাকুরাণী—যিনি তার সাজ বদলেছিলেন, সমস্ত নব বিধবাকে যিনি সাজান—তিনি বলেন অন্য একজনকে, তখুনি বলেছিলাম ক্ষণির মাকে, মেয়েকে নিষ্ঠা শেখাও, বার-বেরতো করাও। দেখলে এখন কি হ'ল? আমার সাত বছরে বিয়ে হয়, আট বছরে বিধবা হই, চোদ্দ বছরে শ্বশুররা পেরাগে নিয়ে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে দিলেন। অত রূপ-যৌবনের দরকার কি? বয়েসকালে ও সবারই থাকে।

যাঁকে বললেন, সে সন্তানের মা। সে শুধু নিশ্বাস ফেলে বললে, কিন্তু দিদি, ক্ষণু মেয়ে বড় ভাল ছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই অমনই ভালই থাকে। তোর এক কথা। যার জন্যে রূপ, তার সঙ্গে তা পাঠিয়ে দিতে হয়।—মাতঙ্গিনী-ঠাকুরাণীর কথার কঠোর স্বরে অপরা আর কথা কইলে না।

মা বাপ ছাড়া যখন সকলে ক্ষণপ্রভার কথা ভুলে গেছে প্রায়, এমনিতর সময়ে একদিন ক্ষণুর মা রাত্রিবেলা খিড়কির দরজা বন্ধ করতে গেছেন, ছায়ার মতন কি একটা স'রে গেল যেন।

তিনি 'মাগো' ব'লে চমকে উঠতেই, সে অতি ত্রস্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, মা!

মা যেন সেইখানে পাথর হয়ে গেলেন।

খানিকটা পরে কি মনে হ'ল যেন, আশ্বস্ত হয়ে তার মুখের দিকে

সর্ব্বাঙ্গের দিকে চাইলেন, কিন্তু সে মিলিয়ে যায় নি তখনও, মিলিয়ে গেল না ; দেয়ালের পাশে তেমনিই দেয়ালে মিশে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

না, মানুষই, ক্ষণুই। ওঁর মনে হচ্ছিল, হয়তো অন্য কিছু, তাই হ'লেই ভাল ছিল যেন।

অসাড় হয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থেকে বললেন, এত রাত্রে কোত্থেকে এলি ?

মার কথায় বোধ হয় তার ভরসা হ'ল। সে কেঁদে ফেললে, চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগল।

মা নির্ব্বাক মূর্ত্তির মতন তার দিকে চেয়ে রইলেন। দয়া মায়া মমতা সে দৃষ্টিতে ছিল কি না কে জানে ; শুধু এক বিরাট প্রশ্ন, যার উত্তর ক্ষণু—ক্ষণপ্রভারা দিতে পারে না, তাই তাঁর চোখে দৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গে ছিল।

সে চৌকাঠের ওপর ব'সে পড়ল। এইবারে মা দেখতে পেলেন, সেই শুভ্র তনুদেহখানি আরও ক্ষীণ, আরও পাণ্ডাশ সাদা দুর্ব্বল হয়ে গেছে যেন। মুখ দেখা যায় না, আভাসে দেখা গেল, সে মুখও আর নেই।

এবারে মার মনে কি হ'ল, বললেন, ওঁকে ডাকি ?

ক্ষণপ্রভা ব্যাকুল হয়ে উঠল, বললে, না না, ও মা আমি পারব না।

মা কঠিন হয়ে উঠলেন। কি পারবি না ? তা হ'লে কি করব ?

মেয়ে আবার মাথা নীচু ক'রে মাটিতে মিশে যেতে চাইলে।

তা হ'লে ওঁকে বলি ?—মা আর অপেক্ষা করলেন না।

স্বামী জেগেই ছিলেন। গৃহিণীর কথায় তাঁর মুখ কঠোর হয়ে উঠল।

কেন এসেছে ? কি বলে ?—তিক্ত স্বরে পিতা প্রশ্ন করলেন।

পিতার কঠোরতায় মায়ের মনে হয়তো করুণা হ'ল। তিনি চুপ ক'রে রইলেন।

কেন এসেছে? বলগে, আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ওর। চ'লে যাক।—পিতা আবার বললেন।

মায়ের কি মনে হ'ল, বললেন, রাত্রিটা রান্নাঘরে প'ড়ে থাকতে বলব? এত রাত্তির—

বাপ এবারে একটু উচ্চ তিক্তকণ্ঠে বললেন, এতগুলো রাত্তির-দিনের ব্যবস্থা যে করতে পেরেছে এতদিন—তোমার আমার অভাবে, সে আজও পারবে। ব'লে দাওগে।

মা কাঠ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে খিড়কির দিকে গেলেন।

সেখানে কেউ নেই। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখলেন, কেউ নেই। তবে কি চোখের ভুল? তবে কি অন্য কিছু? যা ভেবেছিলেন আগে, তাই? তবে কি—

সামনে পুকুর-ঘাট, বাঁয়ে বাঁশ-ঝাড়, দক্ষিণে পথ, সুমুখে ওপারে তাল-নারিকেল-আম-কাঁঠালের বাগান। সব ঘন অন্ধকারের জমাট কালো চোখ দিয়ে অবাক হয়ে ওঁকে, ওঁর হাতের প্রদীপকে দেখতে লাগল যেন।

মা মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, ক্ষণু?

কেউ জবাব দিলে না। অন্ধকারের কোন দিকে কোনও ছায়া কিছু ন'ড়ে উঠল না। মা আবার ডাকেন, আলো নিয়ে একটু এগিয়েও যান।

না, ছায়াও নেই, কায়াও নেই।

গ্রামের নির্জ্জন পথে, একটু দূর হ'লেও, ক্ষণপ্রভার কানে একবার জননীর আহ্বান পৌঁছল, কিন্তু পিতার শেষ কথাও পৌঁছেছিল; গাছে

ধাক্কা খেয়ে, পায়ে হোঁচট খেয়ে, কাঁটা ফুটে, নিজের পায়ের শব্দে, বনের পাতার মর্ম্মরধ্বনিতে নিজেই ত্রস্ত চমকিত হয়ে হয়ে সে যে কোন্ পথের কোন্ দিকের উদ্দেশে যাচ্ছিল, কে জানে। তার কানে শুধু বাজছিল, ওঁদের ছেড়ে এতদিন যে নিজের ব্যবস্থা করতে পেরেছে, সে আজও পারবে। লজ্জা, ধিক্কার, ঘৃণা তার দুঃখকে বেদনাকে কষ্টকে ভয়-ভাবনাকে কোথায় ডুবিয়ে তলিয়ে দিয়েছিল।

গাঙ্গুলীদের বৈঠকখানা। দাবা আর গল্পের বৈঠক। ক্ষণুর বাবাও প্রায় আসেন। সেদিন তিনি সকাল সকাল ফিরেছেন। গ্রামের সত্যেন্দ্র শহরে অর্থাৎ কাছাকাছি সদর-কাছারিতে কি কাজে গিয়েছিল, সেদিন ফিরেছে। ভিড় ক'মে যাওয়ার পর সে বললে, এবার শহরে একটা খারাপ খবর পেলাম।

গাঙ্গুলী উৎসুক হয়ে বললেন, কি খবর? কাদের?

আমাদের কারুর নয়, ঐ রায় মশাইদের।

কি খবর? রায় মশাই তো এতক্ষণ ছিলেন; কই, কিছু বললে না তো?

সত্যেন্দ্র বললে, উনি জানেন না। ওঁর মেয়েকে সেদিন শহরে পেয়েছে, জলে ডুবে মারা গেছে।

সে কি হে? এতদিন পরে? এত কাছে? ছিল কোথা?

তা তো কেউ জানে না। সেদিন নৌকো থেকে নেবে দেখি, ঘাটে খুব ভিড়। একটি স্ত্রীলোক ডুবে যাচ্ছিল দেখে বুঝি এক নৌকোর মাঝি তাকে তোলে, তার আর জ্ঞান হয় নি। পুলিস সব লিখে নিয়ে তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছে, এমন সময় আমি গিয়েছি।

তারপর ?

তারপর—আমার কৌতূহল হওয়াতে একটু উঁকি দিয়ে দেখি, ওঁর মেয়ে ক্ষণুর মত চেহারা যেন। অবশ্য চেনবার মত নয়, তবু মনে হ'ল।

তারপর, তুমি বললে নাকি তাদের ? বল নি তো ?

না। আমি স'রে এলাম সেখান থেকে। হাসপাতালের ডাক্তার, তার সঙ্গে আমার আলাপ আছে, তাকে পরে জিজ্ঞেস করলাম—এমনিই যেন, মেয়েটি আছে, না মারা গেছে ? সে বললে, সে ছিলই না—দুর্ব্বল শরীর ছিল, প্রায় কিছুই ছিল না ; অবস্থা—

গাঙ্গুলী মশাই স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সত্যেন্দ্রও।

তারপর ?—অনেক পরে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন।

আর কিছু বিশেষ জানতে পারলাম না। ডাক্তারটি বললে, আত্মহত্যাই হবে। আমি চুপ ক'রেই রইলাম।

দুজনেই চুপ ক'রে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে গাঙ্গুলী বললেন, হবে বা। দেখ, ঐজন্যেই আমার ভাইঝিটার—আমি সব আচার-ব্যাপারে খুব নিয়ম করিয়ে দিয়েছি। সেই মরল, ছ মাস আগেই মরতে পারত।

সত্যেন্দ্র কোন প্রতিবাদ করলে না।

নিষ্ঠা-সংযম-কৃচ্ছ্রতা-সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম বিবেচনাবুদ্ধিকে, মন্তব্যকে ছাড়িয়ে তার চোখের ওপর যেন ক্ষণপ্রভার নীলাভশুভ্র নিষ্প্রাণ পাণ্ডাশ দেহখানি, বালিকা-মুখখানি ভাসছিল।

মৃত্যুর খবর মা-বাবার কানেও পৌছল।

মা বাপ পাথরের মতই শক্ত হয়ে রইলেন। চোখে জল এসে জ'মে যায়, ঝরতে পথ পায় না। কথা ঠোঁটের আগায় আসে, এসে আড়ষ্ট হয়ে যায়, জমাট বেঁধে যায়।

মা শুধু ভাবেন, তবে কি সেদিন সে এসেছিল শেষ দেখা দিতে—যেমন শোনা যায় সব? আহা, কেন বুকে ক'রে নেন নি!

মনে মনে কেবলই হিসাব করেন, সে দিনটা কবে ছিল? এ খবর পাওয়ার—এই ঘটনার আগে, না পরে? কিন্তু গ্রামের কেউ তো জানে না যে, ক্ষণু একদিন এসেছিল। কি ক'রে জিজ্ঞাসা করবেন কারুকে?

মৃত্যুর দিনটা—সে কি তিনি ফিরিয়ে দেবার পরে? সেই দুঃখেই—তাই কি সে—তাই কি—? জননী শিউরে ওঠেন।

সন্ধ্যার ছায়া ঘাটে ঘনিয়ে আসে, ওপারে অন্ধকার নেমে আসে, অন্ধকার-ভরা কোণে কোণে তিনি চেয়ে থাকেন, ক্ষণু কি আর একদিনও আসবে না?

আর তাঁর ভয় নেই, লজ্জা নেই, ক্ষণু তো নেই আর।

তেপান্তরের মাঠ

শৈলর একতলার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে নীচে চাইলে দেখা যায় শুধু গলির একটুখানি টুকরো ; আর ওপরে চাইলে দেখা যায়, এক ফালি মেঘ বা কুয়াশা কি নক্ষত্র-ভরা নীল আকাশ ; তেপান্তরের মাঠও নয়, মাঠের ওপর রাজপুত্রের ঘোড়াও নয়, দিগন্তরের দৃশ্যও নয়। কিন্তু চোখ বুজলেই একটা তেপান্তরের মাঠ আকাশ বাতাস গলি পথ ভ'রে জেগে ওঠে।

কিন্তু সে মাঠে রাজপুত্রের স্বপ্ন সে কোন দিন দেখে না, কেন না সে রাজপুত্রের গল্পই শোনে নি ভাল ক'রে কখনও। বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে, যাকে নিয়ে বাড়িসুদ্ধ সকলের প্রকাশ্য এবং জননীরও স্বগত ধিক্কারের অবধি ছিল না,—যদি ছেলে হ'ত ! ছেলে হ'লে কি হ'ত, তা অবশ্য জানা নেই, কিন্তু বিয়ে দিতে তো হ'ত না। না, শৈল বিধবা নয় চিরকালকার গল্পের প্লটের বিধবার মতন, শৈলর বিয়ে হয় নি। বয়স এবং রূপ ? বয়স একটা বিয়ের বয়সের সীমায়ই ছিল—ষোল থেকে চব্বিশ পর্য্যন্ত হতে পারে, যাই হোক। রূপ ? রূপ-শতকরা পনরোজন মেয়ের যেমন চেহারা হয়, তেমনিই ছিল। অর্থাৎ বাংলার 'পাঁচ'ও নয়, আবার অলোকসামান্য অপরূপও নয়। ঘষলে মাজলে যাকে রূপ বলা চলে, আর না হ'লে একরকম থাকে। শৈল বিয়ের কথা ভাবতে শেখে নি, কেন না সে জানত (সেটা সে শুনে শুনে বুঝেছিল), আর পাঁচটা ব্যবহার্য্য জিনিসের মত স্বামী সংগ্রহ করতেও খরচা লাগে। জিনিসটা একটু বেশি দামীও। পয়সা না থাকায় আর পাঁচটা বিলাসের মতন স্বামীর বা বিয়ের বিলাসের ধ্যান শৈল করে নি। অন্তত সচেতন মনে করে নি।

সবাই হয়তো ভাববেন, ওর কি তা হ'লে কেউ ছিল না? ছিল নাই তো। শাস্ত্রোল্লিখিত রক্ষণাবেক্ষণ করবার অধিকারী তিনজনের মধ্যে পিতা তো শৈশবে গত হয়েছিলেন, পতির কথা তো বলছিলামই—হন নি, আর পুত্রের কথা তো উঠেই না। আর মাও বাল্যেই অর্থাৎ দশ বছরের মেয়েকে রেখেই গত হয়েছিলেন। শাস্ত্র আর কোন অভিভাবকের কথা উল্লেখ করেন নি। কিন্তু শ্লোকের শেষের লাইন অনুসারে জ্যাঠতুতো ভাইয়ের সংসার ছিল। নিয়ম ক'রে দুবেলা খেত, বছরে ছখানা কাপড় আর চারটে শেমিজ পেত। সকালের রান্না সেরে বেলা দুটোয় এসে ঘরের কোণটিতে শুয়ে আকাশের পানে চাইত, আবার পাঁচটায় আগুন পড়লে রান্নাঘরে ঢুকে রাত্তির পৌনে এগারোটায় ছাড়া পেত।

বাড়ীর কর্ত্রী ছিলেন বিধবা দিদি। তিনি ওর মায়ের চেয়েও বয়সে বড় ছিলেন। আর তিনজন বোন আর কটি ভাজ। তারা কেউ ওর চেয়ে ছোট, কেউ বা বড়, এমনই। মেজবউ, বড়বউ, তাদের সব ছেলে মেয়ে, কারুর তিনটি, দুটি, চারটি। জ্যাঠতুতো ভাই ছজন। ছোট যারা, 'শৈলদি'ই বলে; অমান্য তারা প্রকাশ্যে কেউ করে না।

কিন্তু শৈল একদিন দিদিকে কাকে বলতে শুনেছিল,—সে বুঝি জিজ্ঞেস করে, ও মেয়েটি কে?

দিদি বলেন, ও? ও এই একজন।—ব'লে একটা মুখভঙ্গি করলেন।

সে বললে, আহা, বিধবা?

দিদি বললেন, মূলে মা রাঁধে নি, তার আবার পান্তা! জ্বালাস নি—বিয়ে হবে, তবে না বিধবা!

বিধবা হ'লে একটা সুবিধা ছিল—কৈফিয়ৎ দেবার বিড়ম্বনা থাকত না, উপরন্তু আশ্রয়দাতৃত্বের উদারতার মর্য্যাদাও লাভ করতেন। প্রশ্ন-কর্ত্রী প্রসঙ্গান্তর চর্চ্চায় মনোনিবেশ করলে। শৈল রান্নাঘরে ব'সে

খুন্তি দিয়ে উনুনের অনেকখানি অনাবশ্যক মাটি চেঁচে দিতে লাগল। ও কথাতে অভিমান। দুঃখ করবার মতন ভরসাও ওর নেই ; ভাববার, কথা কইবারও ওর কেউ নেই। মাটিগুলো ঝ'রে ঝ'রে উনুনটা বেশ সুশ্রী হয়ে উঠতে লাগল। শৈল খানিকক্ষণের জন্যে সেইটাই যেন করছিল—এমনই মনে হ'ল, দিদির কথাটা যেন অবান্তর।

গল্পের বইয়ে পড়া যায় যে, কত মহাপ্রাণ যুবক, সদয় তরুণরা ঐ রকম অনাথাকে একেবারে উদ্ধার ক'রে সমাদরে বরণ ক'রে নিয়ে যায়। তা যায় হয়তো। কিন্তু শৈলর জ্যাঠতুতো ভাইদের শালারা, বন্ধুরা ভাই-ফোঁটায় এসে কত রকম খাবার, এমনই বেড়াতে এসে ডিমের সিঙাড়া, মাছের কচুরি, কত কি বিশিষ্ট নোস্তা মিষ্টি ওর তৈরিই খেয়ে যায়। খেয়ে বোনের ননদদের, বোনেদের জয়জয়কার করে। শৈলর আঁচলখানি রান্নাঘর থেকে দেখা যায়—শৈলকেও ; কিন্তু এ তো আর গল্পের বই নয়।

শৈলও শুধু ভয়ে ভয়ে ভাবে, যদি নুন বেশি হয় কচুরিতে বা কম হয় তো কি হবে ? যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। হ'ল, হ'লই বেশি। কিন্তু ও কেবলই ওই রকমই ভাবে।

কিন্তু ওরা খেয়ে বলে, বাঃ, চমৎকার দিদি! কে করেছে ?—'আপনি', নয়তো 'তুমি' ?

কথার উত্তর না দিয়ে দিদি এবং বোনেরা সহাস্যে বলেন, নে না আর দুটো ; কিই বা খেলি ? বাড়ি গিয়ে না হয় আজ খাস নি।

সেদিন না হয় ওঁরা করেন নি, কিন্তু শৈল শিখল কার কাছে ? শৈল জানত কি ? আজকে ও করেছে বটে, কিন্তু শেখা ? সেটা তো মানতে হবে। সে হিসেবে ধরতে গেলে ওঁদেরই করা।

শৈল 'চমৎকার' শোনে, ভাবে, বললেন বুঝি, শৈল করেছে। কিন্তু কিছুই আর শোনা যায় না।

তা হোক, রান্না ভাল হয়েছে তো? তা হ'লেই হ'ল। ওর চেয়ে বেশি আশা শৈলর মনেই জাগে না।

দোতলার ওপরে জাঠতুতো ভাইদের শোবার ঘর, তারা গল্প করে, গান গায়। ওদের ঘরের পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে শৈল রাত্তিরে এক একদিন দোতলায় ওঠে। কিন্তু দোতলার স্বর্গের ধ্যান সে করে না। ওর বুকের বালিকা শৈল এখনও মনকে রূপকথা ব'লে ভোলায়। সেদিন ওর আকাশটা বড় হয়ে যায়। এক আকাশ তারাসুদ্ধ যেন হাসিতে ভরা কার মুখ ওর পানে চায়। তারা যেন ওকে রূপকথা বলে, যে রূপকথা ও মার কাছে শোনে নি, যা তিনি শেষ ক'রে বলেন নি, যা কেউ বলে নি কখনও। তাই, আর পারুল বোনটি। ওর যদি ভাই থাকত! শৈল শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে। তেপান্তরের মাঠ কি রকম দেখতে হয়? শৈল বই বেশি পড়ে নি, মানে ও সব কথার মানে জানে না। ভাবতেও খুব গুছিয়ে পারে না, হিংসে করতে পারে না, রাগ করতে ভরসা পায় না, কাঁদতে অভিমান করতেও পারে না, ও শুধু ভয় পায় সবাইকে। কেউ কিছু বললে ও শুধু ফ্যালফ্যাল ক'রে চায়। তারপর ভুলে যায়। রাস্তা নিঝুম হয়ে গেল, পথিকের যাওয়া-আসা ক্রমশ ক'র্মে এল, পাশের বাড়ির বুড়ো কর্ত্তা কেবলই কাসেন। পাড়ার বাড়ির আলোগুলো নিবে আসে, ওর চমক ভাঙে, ও আবার তেমনই নেমে আসে।

দোতলার ঘরের কাছে একটু দাঁড়ায়। বউয়েরা সবিস্ময়ে বলে, কি শৈল ঠাকুরঝি?

ও বলে, কিছু না। নেবে যায়।

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে একজন বউ বলে, এত রাত্তিরে ছাতে ওঠা কেন?

শৈলর কানে যায়। মার বুঝি আগে দু একটি ছেলে মেয়ে হয়ে

মারা যায়, তাই তার নাম রেখেছিলেন সইল। তা সইল ভাষাতত্ত্বমতে শৈল বানানে নাম হয়ে উঠল। তখন ছিল সইল, এখন হ'ল শিলা থেকে। পেছনে এল উপসর্গ বালা। এ শৈল কিন্তু শিলার নয়— যেন পাথর নয়, আর কিছু, যেন স্রোতের শৈবালের মত। যেন গৌরী নয়, গিরিবালা। তবে শিলার মত সহিষ্ণু বটে।

সকালে উঠতে বেলা হ'ল সেদিন। কে বউ বললে, অত রাত অবধি জেগে থাক ঠাকুরঝি, তাই বেলা হয়। যেন রোজই বেলা হয়।

শৈল অপ্রস্তুত মুখে বললে, আজ বড় বেলা হয়ে গেছে। দিদি, একটু তেল দেবেন? দিদি তেল মাখাচ্ছিলেন ভাজের চুলে। শৈলর আতেলা রুক্ষ মাথাটাতে এত চুল কি ক'রে যে থাকে!

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, একে তো উঠতে বেলা করেছ, তারপর ঐ কাঁড়ি চুলে তেল দেবে, তবে নাইবে, রান্নাঘরে ঢুকবে?

শৈল অপ্রতিভ মুখে ফিরতেও পারলে না, দাঁড়াতেও না। দিদি যদি বলেন, অত তেজ কিসের? বিরক্তিভরে দিদি বললেন, নাও, একটু নিয়ে যাও।

হাত পেতে তেল নিয়ে সে কলতলায় গেল। বিধবাদের চুল কাটতে আছে সে দেখেছে, কিন্তু ওদের কি কাটতে আছে? কিন্তু অত ভাবনার সময় আছে? দুটো উনুন জ্ব'লে খাই খাই করছে। চুলোয় যাক চুল আর নাওয়া।

বেলার আর বাকি নেই। দুটো বাজল। খেতে ব'সে দিদির খুব গল্প করা অভ্যাস। সেদিন হচ্ছিল অল্পদিন আগের পুষ্করদর্শন-বৃত্তান্ত। বাপ রে, সে কি দুষ্কর পথ! তোমরা কেউ পারতে না হাঁটতে বড়বউ। আর কি কুমীরের ছিষ্টি সেই হ্রদটায়!

বড়বউ বললেন, দিদি, তুমি নেবেছিলে নাইতে? ভয় করল না?

মেজবউ বললে, মাছের ঝোলটা আজ বেশ হয়েছে। নিরামিষ দিক থেকে দিদি বললেন, আর একটু ক'রে দাও না শৈল।

শৈল মাছের কাঁসিখানা নিয়ে এল।

বড়বউ বললেন, কই, দেখি? একখানা নেজা আর কানকো দুখানা? আচ্ছা, নেজাখানা মেজবউকে দাও আর কানকো একখানা আমাকে দাও। এবার তুমি ব'সগে, আর আমরা কিছু নোব না।

পুষ্কর, প্রয়াগ, বৃন্দাবনের গল্প চলতে লাগল। বেলা আর নেই, শীতের বেলা যেন দৌড়ে চলে।

শৈল ছ আনা দামের দিদির পুরোনো মাদুরখানা উত্তরাধিকারসূত্রে নয়—দয়াসূত্রে লাভ করেছিল, সেইখানা পেতে শুয়ে পড়ে। শুধু কি ভাবে যেন।

গলির মাথায় নীল আকাশটুকু দেখা যায়। সাদা সাদা মেঘ হালকা-ভাবে তুলোর মতন প'ড়ে আছে তার ওপর। ওরই মত যেন শৈলরও জীবনের পাতায় সুখ দুঃখ ব'লে বিশিষ্ট কোন অধ্যায় নেই। মনের লেখা ইতিহাসের যত দূর ওর মনে পড়ে—কিছুই বিশেষ নয়। না খেলনা পুতুল, ফিতে কাঁটা, ভাল কাপড় জামা শাড়ি গহনা, কি কোন তুচ্ছ বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও করে নি, ভাবেও না। শান্তিও নেই, অশান্তিও নেই। ওর অত ভাববার শক্তিই নেই, জানেই না। শুধু একটা একটা ছাড়া ছাড়া ভাবনা, তা নিজেরও সবটা নয়, ভাবে। হয়তো ভাবে, দিদিরা কেমন পুষ্করতীর্থ করতে গিয়েছিলেন, খেতে ব'সে গল্প করছিলেন। কি উঁচু পাহাড়ে উঠতে হয়! কি বালি নাকি! যেন বালির সমুদ্দুর—দিদি বলছিলেন। ওর নিজের যাবার সাধ? না, দুরাকাঙ্ক্ষা করবারও একটা ক্ষমতা দরকার, ওর ও দিকটা নেই। যে অত ভীরু, সে কখন আপনার কথা ভাববে? ও ভাবে, সাবিত্রী ঠাকুর ওঁরা দেখে এসেছেন,

আবার গায়ত্রীও আছেন, সুন্দর নাকি মূর্ত্তিটি। সাবিত্রী নাকি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ঐ উঁচু পাহাড়ে উঠে ব'সে ছিলেন, আর সেই অবসরে স্বামী ঐ গায়ত্রীকে বিয়ে ক'রে ঘরকন্না করতে আরম্ভ করেন। ওর একটু হাসি পেল। স্বামীর কথায় ওর বছর তিনেক আগের একটি ঘটনা মনে প'ড়ে গেল। ওর জ্যাঠতুতো বোনের বিয়ের সময় সকলে ওঁদের নিন্দে করতে লাগল, বুঝি তাই ওরও একটি সম্বন্ধ এসেছিল। একদিন সকালে কারা দুজন দেখতে এলেন। তাড়াতাড়ি ওকে রান্নাঘর থেকে বের ক'রে মুখে খানিক সাবান স্নো ঘ'ষে মেজবউদির একটি সিল্কের শাড়ি আর তারই জামা, ঢলঢলে হ'ল—তাই পরিয়ে মেজবউ কার একটা হার পরাতে চাচ্ছিল, দিদি বললেন, না হার দিস নি, তা হ'লে বিয়ের সময় দিতে হবে। হাতে ওর মার বালা আছে, ওতেই হবে।

বৈঠকখানায় ভাইয়েরা নিয়ে গেলেন। ও প্রথমেই একবার চাইতেই দেখলে একটি কাঁচা-পাকা—বেশির ভাগই পাকা চুলে ভরা, মাঝখানে অল্প টাকপড়া-মাথা একটি ভদ্রলোককে, আর ও চোখ তুলে চায় নি। ও গিয়ে বসল। সেই ভদ্রলোকটিকে ও ভেবেছিল, তিনি শ্বশুর—যাঁকে 'তোমার নামটি কি মা?' জিজ্ঞেস করলে মানায়, তিনি বললেন, নামটি কি?

ও বলে, শ্রীমতী শৈলবালা দেবী। অপরজন জিজ্ঞাসা করলেন, বয়স কত? তা বুঝি দাদারা হকচকিয়ে কি বলবেন ঠিক করতে না পেরে একসঙ্গেই একজন বললেন ষোল, একজন বললেন, আঠারো। মোট কথা, ওঁরা কত বয়স চান? তা হ'লে ঠিক ক'রে বলা যেত।

ভদ্রলোকেরা একটু হাসলেন শৈলর বোধ হ'ল, কিন্তু ও তো মুখ তোলে নি। পরীক্ষা হয়ে গেল। বোবা নয়, নাম বলতে পারে; খোঁড়া

নয়, চলতে পারে; আর কানাও নয়, চোখ দুটি পদ্ম-চোখ না হোক, পরিষ্কার দুটি চোখ।

ওঁরা বললেন, নিয়ে যান। ও চ'লে আসতে আসতে শুনলে, দাদারা বলছেন, ও বোনটি আমাদের খুব কাজকর্ম্ম পারে—ইত্যাদি। ভেতরে এসে কাপড়-চোপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকল ভাতের ফেন গালতে। তারপর সব দাদারা ভেতরে এলেন, দিদি বললেন কি হ'ল, পছন্দ হ'ল? জবাব এল, না; ওরা বললে, বড় ছোট মনে হচ্ছে। ঐ বুড়ো ভদ্দরলোকটিই বিয়ে করবেন কিনা—মাস কতক হ'ল স্ত্রী গত হয়েছে, চারটি ছেলে তিনটি মেয়ে—সুন্দরীগাঁয়ের স্টেশন-মাস্টার। একটু বেশি বড় চান—আমার কেমন ভুল হ'ল, নইলে বয়স ওর কুড়ি হ'ল না? তা আবার খবর দেবে। কিছু দিতে পারলে হ'ত। দিদি বললেন, ওঃ, তা আর কোথায় পাবি? ভাজেরা বরের বর্ণনায় মুখ টিপে হাসলে।

কিন্তু আর তাঁরা খবর দিলেন না এবং বরের বা স্বামীর কথায় নিজের সম্বন্ধে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছাড়া আর কারুরই কথা মনে আসে না, আর মনে হ'লেই কেমন ওর হাসি পায়, ও ভেবেছিল যে, তিনি 'মা' ব'লে কথা কইবেন। যথাসময়ে বোনদের বিয়ে হয়ে যেতে লাগল, তা যাক। কিন্তু সাবিত্রী কি বাবু—এত রাগ, আর ওঁরই বা কি বিয়ে করা? শৈলর নীল আকাশটুকু ঝাপসা হয়ে গেল; চোখের সামনে জেগে ওঠে প্রকাণ্ড দিক-দিগন্তহীন প্রান্তর—বাংলা দেশের মাঠের মত সবুজ নয়, শ্যামল নয় —এ মাঠ শৈল কখনও দেখে নি, এই যেন সেই তেপান্তরের মাঠ। অনেক দূরে এক দিকে পাহাড়ের সারি, বেঁটে বেঁটে বাবলাগাছ এখানে ওখানে, আর শুধু পুরীর বালির মত ধুধু-করা বালি। যেদিকে তাকায়, সুমুখে পাহাড়ের ওপারে সাদা কি দেখা যায়—যেন বাড়ির মতন, সমতলে পেছনে দূরে মেটে ঘর। কোন্ দিকে যাবে, শৈল ভাবে। কিসের

জন্যে তা ও জানে না, শুধু ভাবে, আগে ঐ মন্দিরের দিকে যাবে—না কোথায় যাবে, কোন্ পথে এল তাও বোঝা যায় না। পাহাড়ে প্রান্তরে আকাশে আর অমিল নেই—সমস্ত শূন্য ভ'রে তারা ওরই পানে চেয়ে আছে শুধু।

ও দিদিমণি, আকা যে পুড়ে খাক হয়ে গেল, কত ঘুমোতে লেগেছে গো দিনের বেলায়!—পরিষ্কার কাংস্যকণ্ঠে ঝির আহ্বান কানে এল।

শৈল ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। দিদির গলা শোনা গেল, সকালে তিনমণ কয়লা পুড়বে, সন্ধ্যেয় দুমণ পুড়বে তবে ঘুম ভাঙবে, অমনি! শৈলির দিনেও কি মড়ার ঘুম!

অপ্রতিভ শৈল কাপড় কাচতে কলতলায় গেল।

দুধ, বালি, সাগু, তারপর ডালের পরে ভাত, তারপর চচ্চড়ি, ডালনা, মাছ, রুটি, লুচি খানকতক। বড়দার বসবার ঘরের ঘড়িতে একটা একটা ক'রে কতগুলো বেজে যায়। চাকি-বেলুন, হাঁড়িকুঁড়ি ধোওয়া-মোছা হয়। এক এক ক'রে সকলের খাওয়া হয়ে যেতে থাকে। সবাই চ'লে যায়। ও নিজের ভাত কটি নিয়ে বসে। কেউ জিজ্ঞাসা করে না, কি আছে না আছে, সেও কিছু বলে না। সে বলেও না, ভাবেও না—কলটেপা পুতুলের মত কাজ শেষ ক'রে চলে।

রাত্তিরে আবার জানলা দিয়ে নক্ষত্রভরা আকাশ—কোন্ অজানা দেশের রূপকথার বইয়ের পাতা মেলে ধরে ওর চোখের সামনে। ছায়াপথের একটুখানি দেখা যায়। ওর কাছে যেন আকাশ আর পৃথিবী একই—সবই সমান যেন। ওটা যেন আর একটা পৃথিবীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; রাত্রে তার রোজ দেওয়ালি, সকালে সূর্য্যের আলোর ধারাস্নান, ওর সাজ নেই তাই মেঘের রঙের উৎসব। কিন্তু তেপান্তরের মাঠটা? কোন্ দিকে? কি রকম দেখতে? আচ্ছা, যদি কেউ ওকে নিতে

আসত? রাজপুত্র? না, আগেই তো বলেছি, ও সে কথা ভাল ক'রে শোনেই নি। তবে? মৃত্যু? না, ওর অভিমান নেই, রাগ নেই, কষ্ট নেই, ও শুধু সবাইকে ভয় করে, তাও শান্তভাবে, মৃত্যুকেও সে ভাবে না, মরণের মত অভিমান ওর মনে জাগেই না। তবে কে নিতে আসবে? তা সে জানে না। রাত্তিরের আকাশের ঝিকমিকে হাসিমুখ তার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসে, ঘুম-চোখে শৈল তেপান্তরের মাঠের একখানা ছক খুঁজে খুঁজে বেড়ায় যেন সব জায়গায়—যদি পার হতে পারে।

মা

শুধু মা নেই।

আর সকলেই আছেন। এপক্ষে ঠাকুমা পিসীমা কাকা জ্যাঠা বাবা খুড়ীমা জ্যেঠীমা, ওপক্ষের দিদিমা মাতামহ মাসীরা মামারা—সবাই বর্ত্তমান। আদরের অবধি নেই, স্নেহের সীমা নেই; ব্যাকুল মমতায় সমস্তক্ষণ সবাই তাকে ঘিরে রাখেন। বাপের বাড়িতে প্রচুর স্নেহ, মামার বাড়িতেও প্রচুর প্রশ্রয়, কোনখানে ফাঁক নেই।

বাড়িতে একবাড়ি ছেলে। প্রত্যেক ঘরে কলরব-কোলাহল, ঝগড়াঝাঁটি, মিলন খেলার স্রোত ব'য়ে যায়, যখন যেটা খুশি। দরকার-মত প্রয়োজনমত এ ওকে পেটে, কান ম'লে দেয়; এবং নালিশ শুনবামাত্র মারা এসে একসঙ্গে দোষীনির্দ্দোষীনির্ব্বিশেষে আপন আপন সন্তানকে মেরে শায়েস্তা ক'রে যান।

কিন্তু নিতাইকে কেউ মারে না, বকে না, কিচ্ছু না। বরং কোনও ছেলে যদি ছেলেমানুষী ঝগড়া করে, অমনই সবাই বলেন, ছিঃ, ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'র না, কিংবা ওকে মারতে নেই।

ছেলেরা মনে মনে চটে, ভাল জ্বালা, ও কে? ও কোন্ নবদ্বীপচন্দ্র? কেউ বা চুপ ক'রে থাকে, কেউ বলে, কেন? ও বুঝি ঝগড়া করে না?

জননীরা প্রশ্নের জবাব দেন না, শুধু আদেশ করেন, উপদেশ দেন।

মামারা কাকারা খাবার খেলনা জামা কাপড় এনে আগে দেন ওকে, তারপর সবাইকে। সবাই চুপ ক'রে থাকে; কিন্তু নিতাইকে ভাল লাগাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হতে থাকে।

নিতাইয়ের একঘর খেলনা সাজানো প'ড়ে থাকে। ভয়ে কেউ খেলে না, ও জিনিস না নিয়ে নির্লোভীর মতন খেলা ক'রে কে চ'লে আসতে পারে? কাজেই সেগুলো প'ড়ে থাকে। সে ওদের ডাকে খেলতে, রাজার মতন সব ঐশ্বর্য্য দান ক'রে দেয়।.

সন্ধ্যাবেলা সবাই মার কাছে যায়, কারও বা ক্ষিদে পায়, কারও ঘুম। মারা ছেলেদের নিয়ে তাদের প্রয়োজন সাধন করেন। নিতাই ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে এসে ঠাকুমার পূজোর ঘরের কাছে দাঁড়ায়। ঠাকুমা বলেন, এই যে যাই দাদা, হয়েছে, যাই।

বিছানায় উঠে সে দু হাত দিয়ে ঠাকুমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে। আচ্ছা ঠাকুমা, আমি তোমায় 'মা' বলি না? সবাই তো 'মা' বলে মাদের, তুমি তো আমার মা?

ঠাকুমা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, ওকে জানানো হয় নি, ওর মা নেই। হ্যাঁ দাদা, 'মা' ব'ল, তবে আমি তোমার বাবার মা।

বাবার মা কি নিজের মা হয় না?—নিতাই প্রশ্ন করে।

হয় বইকি ধন। উত্তর দিতে চোখে জল আসে।

আকাশে তারা ঝিকমিক করে, নিতাই তাকিয়ে থাকে জানলা দিয়ে বাইরে। আবার কি ভাবে, বলে, আচ্ছা ঠাকুমা, আমার ওই রকম খুড়ীমাদের মতন গয়না কাপড় পরা মা নেই কেন? তোমার মতন মা কেন? আমার ঐরকম মা বেশ লাগে।

ঠাকুমা কাতর হয়ে বলেন, আছে বইকি বাবা, সেই রকম মা; শোন, সেই কড়িগাছের গল্প শোন।

গল্প আরম্ভ হয়—সেই কড়িগাছ, হালুম ক'রে বাঘের আগমন, সেই বামুনদের মেয়ে, তার ভাই মা, বাঘের মুখে গরম ফেন ঢেলে দেওয়া—

নিতাইয়ের গম্ভীর মুখে হাসি ফোটে; ওর মন রচনা করে, লালপেড়ে

কাপড় পরা, ঘোমটা দেওয়া, রান্নাঘরে থাকা একজন মা, দিদিদের মত সুন্দর একটি মেয়ে। তারপর অন্যমনে ঘুমিয়ে পড়ে।

২

বাবা-কাকারা বলে, মা, নিতের লেখাপড়া হচ্ছে না, আর আদর দেওয়া নয়, ওর পরকাল নষ্ট করছ তুমি।

পিতামহী নির্ব্বাক হয়ে থাকেন, বেশ বুঝতে পারেন নিজের দুর্ব্বলতা, কিন্তু মন কথা শুনতে একেবারে বিমুখ।

নিতাই উন্মনা, আপন মনে ঘোরে ফেরে। সকল ছেলে পড়তে বসে, না পড়লে বাপের কাছে ধমক খায়, মার কাছে শাসিত হয়।

নিতাই নিরঙ্কুশ। তবু ভাবে, আচ্ছা, তবে কি ঐ রকম ঘোমটা দেওয়া, শাড়ি পরা মা-রা মারে, আর এই রকম ঠাকুমা ব'লে ডাকা মা-রা মারে না? মারলেই বা মা-রা। ওরা তো ভালই। ওই তো কানাইয়ের মা, লালুর মা কত আদরও করে।

পড়াশোনা হয় না। দুরন্তপনাও করে না, খেলাও করে না; খেলনা তার অনেক সাজানোই থাকে।

কাজের বাড়িতে গোলমাল, সব ব্যস্ত। ঠাকুমা বাড়ির গিন্নী, তাঁর নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

কত রাত্রে সকলের খাওয়া শোওয়া হ'লে ঠাকুমা বিছানায় ঢুকে বিছানা খালি দেখলেন, ডাকলেন, হ্যাঁগা বউমা, নিতাই কোথায়?

অনেক খোঁজের পর দেখা গেল, বৈঠকখানা-ঘরে একটা তাকিয়ার পাশে সে ঘুমোচ্ছে।

জ্যেঠীমা পিসীমা খুড়ীরা সব এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জ্যেঠীমা বললেন, ওমা, তাই তো, আহা! মা তো আজ আসতে সময় পাও নি, তাইতে ও আর ওপরে ওঠেই নি! নবাগতা ছোট পিসীমা ছিলেন দাঁড়িয়ে, বললেন, আহা, মা নেই কিনা, আপনিই কেমন হয়ে থাকে!

ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল, সন্ধ্যেয় পরা মখমলের জামাটা ছাড়তে ছাড়তে সে চকিত হয়ে পিসীমার দিকে চাইলে, তারপর ঠাকুমার দিকে।

ঠাকুমা কন্যাকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলেন। নিতাই চুপ ক'রে শুয়ে পড়ল। তবে সত্যি মা নয়, ঠাকুমাই? সারারাত্রি একটি বধূ-মায়ের স্বপ্ন নিতাইকে ঘিরতে লাগল।

ভোরের আলোয় ঠাকুমার পাশে সে জাগল। সেদিনও জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ ঠাকুমা, আমার বুঝি একজন মা ছিল? ঐ রকম গয়না কাপড় পরা? কোথায় তিনি?

আকস্মিক অতর্কিত প্রশ্নে পিতামহী বিব্রত হয়ে বললেন, কে বললে তোমায়?

ঐ যে পিসীমা। তাঁকে আনাও না একদিন ঠাকুমা!

ঠাকুমা তেমনই বিচলিতভাবেই বললেন, হ্যাঁ, আসবে বইকি। এই বলব 'খন আসতে। এখন এস, খাবার খাও। আমার সঙ্গে যাবে? গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসিগে, কেমন?

ঘাটেও কত ছেলে, সবারই তো মা! কেউ তো ঠাকুমা ব'লে মাকে ডাকে না! অনেক মাটির পুতুল সিঁড়িতে একটি বুড়ী বিক্রি করছে; ছেলে-কোলে-মা একটি পুতুল সে এক পয়সা দিয়ে কিনলে।

নিতাই জলে অর্দ্ধনিমজ্জিতা পূজারতা পিতামহীকে প্রশ্ন করলে, আমি এইটে নিই ঠাকুমা, এই মা-টি?

ঠাকুমার জলার্ঘ্য প'ড়ে গেল, মন্ত্র ভুল হয়ে গেল। পার্শ্ববর্ত্তিনী একজন বৃদ্ধা বললেন, আহা, খোকাটির বুঝি মা নেই?

ঠাকুমা ইঙ্গিতে সজলনেত্রে বললেন, নেই।

নিতাই ঘাটের সিঁড়িতে উপস্থিত সমবয়সী একটি বালককে জিজ্ঞাসা করলে, ও কে হয়, তোমার মা বুঝি?

হ্যাঁ।

ঠাকুমা মা?

বালক সবিস্ময়ে বললে, ঠাকুমা কেন, ও তো মা।

আহ্নিক সেরে ঠাকুমা ডাকলেন, ও নিতাই, ডুব দিবি একটা?

কল্পনা-ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে সাগ্রহে নিতাই জলে নেমে গেল।

৩

মাস্টার মশাই পড়াতে আসেন। ও পড়ে না, কথাও কারুর শোনে না, খেলাও করে না। আপন মনে কি ভাবে, কি স্বপ্ন দেখে, কে জানে! খাবার খেতেও আসে না, চায়ও না কিছু।

সবাই ডাকেন, ও নিতু, খাবার খা!

ওরে, নিতু দুধ খায় নি যে।

সবার আগে নিতাইয়ের সব রাখা হয়, তবু নিতাইকে পাওয়া যায় না।

নিতু আসে আর চ'লে যায়।

মাস্টারের কাছে পড়া করে না, মন দেয় না। সন্ধ্যেবেলা জননীর গল্পের আসরে কাকা এসে বললেন, দেখছ মা, নিতের পড়াশোনা? কিছু

পারে না। মা নেই ব'লে কি গোমুখ্যু ক'রে রেখে দেবে? ওর উপকারটা তাতে কি হবে শুনি? তোমার নাম ক'রে পালিয়ে আসে প্রায়ই।

পিতামহী বিরক্তমুখে ব্যাকুলকণ্ঠে পুত্রকে বললেন, আহা, কি বকিস যে!

কাকা অপ্রতিভ হয়ে চ'লে গেলেন।

নিতাই ঠাকুমার পাশে চুপ ক'রে শুয়ে ছিল, মা তবে নেই? কোথায়? স্বর্গে? আকাশভরা তারা; স্বর্গ কোন্‌খানে? কি রকম মা, গয়না কাপড় পরা খুড়ীমা, না ছোট মাসীর মতন? আদর করতেন সেই মা? খাবার দিতেন, সে তাঁর কাছে শুতো? কোথায় তিনি?

ঠাকুমা গল্পের ছিন্নসূত্র তুলে নিয়ে বলতে লাগলেন, তারপরে হাঁড়িটি ভাসতে ভাসতে নদীর তীরে সেই বুড়ো মালীর ঘাটের সিঁড়িতে গে ঠেকে। ও দাদা, ও মানিক, এইবার খেতে যাও, রূপকথা শেষ আজ আর হবে না, ঘুমিয়ে পড়েছ।

দুষ্টুমি ক'রে মটকা মেরে প'ড়ে থাকে না, ছিঃ!—আবার বলেন পিতামহী।

ধ্যানমগ্ন বালক কখন স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাকুমা চোখের কাছে নীচু হয়ে দেখলেন, দু ফোঁটা জল চোখের পাশ থেকে গড়িয়ে এসেছিল, তখনও শুকোয় নি।

তারপর থেকে উন্মনা মাতৃহীন বালক সংশয়হীন হয়ে পড়ায় মন দিতে বসে, "শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয় না—যে লেখাপড়া করে না, কেহ তাহাকে ভালবাসে না।"

দর ও দস্তুর

পর, পর মা, গয়না পর।

ওরা কনে দেখে ফিরে গেল, গহনা কাপড় সব ছেড়ে ছাতের কোণে এসে ব'সে নিভার চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে জল পড়ছিল।

সূর্য্যাস্তের সময়। রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিগন্ত। কালো কালো মেঘ, এক দিকে গোটাকতক সোনালী-পাড় কাপড়ের মতন প'ড়ে আছে। অন্য সময় ঐ শোভা দেখাতে সে ছোট বোনকে মেজ বোনকে ডাকে, আজকে তার চোখে ওসব শোভা হিসেবে পড়ছিল না আর। এমনিই চেয়ে ছিল।

আজকে ওরা আবার—বড়রা কেউ ছিল না—সব নাকি ছেলেটির বন্ধুরা,—ওকে ইংরিজী বাংলা লেখালে।

ওরা কি জানে না, ও লিখতে জানে? কেন, ছোটকা তো বললেন ওর সামনেই যে, ওকে সেকেন ক্লাস অবধি পড়িয়ে আমরা স্কুল ছাড়িয়ে নিয়েছি, বড় বড় মেয়ের স্কুলে যাওয়ার প্রথা আমাদের বাড়িতে নেই কিনা। তারপর বললে, গান জানে?

কাকা বললেন, জানে; কিন্তু ওর লজ্জা করবে মশাই, ছেলেমানুষ কিনা। একটা ছেলে একটু মুখ টিপে হেসে বললে, ছেলেমানুষই মেয়ে হয় মশাই।

গান গাইতে গলা কেঁপে গেল, ছাই হ'ল গান। অত ছাই ও কোন দিন গায় না, এমন কি বিচ্ছিরি ক'রে চেষ্টা করলেও ও রকম হয় না। কাকা কেন বললেন না, গান ও জানে না!

ওর চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে জল পড়তে লাগল। ওরা নাকি সভ্য,

ওরা নাকি সব বিদ্বান! ওদের বোনকে এদের কেউ অমনই ক'রে দেখে!

মেজদি এল কাপড় কেচে, ছাতে কাপড় শুকুতে দিতে।

ওমা, তুই বুঝি এখানে ব'সে, আর মা সারা পৃথিবী খুঁজছেন! খাবার খাস নি যে? কাঁদছিস কেন?

ও রাগ ক'রে বললে, কই কেঁদেছি? চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জলে ভ'রে এল।

ওরে, এ দুঃখ সবারই করতে হয় রে, তোর একার নয়। আমাকে আবার আমার মামাশ্বশুর সমস্ত দালানটা হাঁটিয়ে নিয়েছিলেন। আর একটা কে ছিল, সে বললে, চুলটা খুলে দেখান নি কেন মশাই? বড় খোঁপা দেখে ভাবলে বোধ হয়, গুছি দিয়ে চুল বাঁধা। ও তো ভাল। সেই প্রতিমার—আমার ননদের মেয়ে রে, খুব সুন্দর দেখতে, মনে আছে তো? তাকে আবার দেখতে এসে সব বলে, মশাই, হাতে মনে হচ্ছে কড়া পড়েছে। নন্দাইয়ের রাগে মুখ লাল হয়ে গেল, তবু বললেন, টিপে দেখুন হাত। ছেলেটি এম. এ. পাস করেছেন, বাড়ি আছে নিজের, বাপ মা আছে, কি করা যায়, সবই সহ্য করলেন। কিন্তু এখন যদি হাত দুটো দেখিস তার! শাশুড়ী ঝি-চাকরের জল-বাটনা নেয় না। রোজ তাল তাল বাটনা বাটে, জল তোলে। মুখখানি কচি টুলটুল করছে, হাত দুখানা যেন কার! তা হ'লে কড়া পড়া তখন কেন যে বলেছিল, কে জানে!

কথাগুলো খুব আশাপ্রদ নয়। নিভা অবাক হয়ে শুনছিল। সে বললে, দিদি, তোমাকে তারাই পছন্দ করলে, যাঁরা হাঁটালে?

মেজদিদি বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই হাসলে, হাঁটালেন তো বাড়ির কেউ নয়, মামাশ্বশুর।

নিভা আরও অবাক হয়ে বললে, জামাইবাবুর মামা তো। তা তুমি সেখানে গিয়ে রাগ কর নি, কিচ্ছু বল নি কারুকে? জামাই-বাবুকেও না?

ওঁর দোষ কি? আর এ যে রেওয়াজ, সবাই এই করে।

নিভার রাগে গা জ্ব'লে যায়। কিন্তু মেজদির যেন সবই খুব সহজ মনে হচ্ছে।

পাশের বাড়ির ছাতে কে উঠলেন, বললেন, তোমাদের নিভাকে আজ দেখে গেল? কি বললে?

মেজদির উপদেশ-স্রোত থামল। কথার গন্ধ পেয়ে পুলকিত হয়ে আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, হ্যাঁ, দেখে তো গেল, এখনি কি কি বলবে, কিছুই বলে নি। (ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে) আর শ্যামবর্ণ কিনা তাই, সহজে কি পছন্দ কবে? বাবা এই দুটি ছোট বোনের বিয়ে দিতে জেরবার হয়ে যাবেন ভাই। যে দেখছে সেই বলে, সব ভাল মশাই, কিন্তু রংটি যদি একটু ফবসা হ'ত। গান গাওয়ালে, লেখা দেখলে, কত কি।

প্রতিবেশিনী একটু মুখভঙ্গি ক'রে বললেন, লেখা নিয়েই বা কি করবেন? গানেই বা কি কববেন? সেই সুনীরার কথা মনে আছে তোর? সেই যে আমার ছোট পিসীমাব মেয়ে? কি চমৎকার গলা, পাড়ার লোক দাঁড়িয়ে যেত গানের সুরে তার। রং তেমন ছিল না, ঐ গানের আর বাপের টাকার জোরে, বিযে তো হ'ল, এখন শুনি নাকি বর কারুর কাছে কোন জায়গায় গান গাওয়া পছন্দ করে না। বড্ড খপিশ! বলে, মেয়েদের আবার বিয়ের পরে গান কি! কোনখানে পাঠায় না। মেয়ে-যজ্ঞিতেও গাইতে বারণ, কাজের বাড়িতে পাঁচটা পুরুষ আসে তাই।

মেজদি বললে, অথচ মরবে সব বিয়ের সময় সব জিজ্ঞেস ক'রে। যার হাতে পড়বে সেই যদি ওসব না চায়—ছাই দরকারেও লাগে না।

তা দরকারে লাগে না বটে, কিন্তু সুনীরার মেয়েটি যে কি চমৎকার গায়!

মা এলেন, কথায় বাধা পড়ল।

হ্যাঁরে, নিভা কই? কি সব ঢং বল তো, খাবার খেলে না অবধি! চিরকালকার জিনিস, তারা নিয়ে যাবে—দেখবে না? দেখেছে তো মেয়ে অমনি গ'লে গেলেন!

মার পেছন দিয়ে নিভা নেবে গেল।

ভাল লাগে না জানি, তা কি করব ছাই!—একসঙ্গে এত কথা এবং এত রাগ গলার কাছে জড় হ'ল যে, মার আর কথা বেরুল না মুখে।

অনেক রাত্রি।

ছোট ছেলেরা সকলে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েছে। পুরুষদেরও খাওয়া চুকেছে, মার কাজ সারা হ'ল।

পাশের ঘরে মেয়েছেলেরা ঘুমোচ্ছে, নিভাদের বাবা এ ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছেন।

নিভার জননী জলের ঘটি, দুধের বাটি, পানের ডিবে, মিছরি বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। একে একে সবগুলি যথাস্থানে নাবিয়ে স্বামীর বিছানার পাশে এসে বসলেন।

তারপর?

স্বামী বললেন, কিসের?

এই যে গো, নিভাকে দেখে কি বললে? পছন্দ করেছে ছেলে?

স্বামী বললেন, কাল ওর বোনেরা, মা আর ঠাকুমা আসবে দেখতে ; ছেলের ছোট ভাই ছিল, ব'লে গেল।

মাতা পিতা তুজনেই জানালার পথে রাস্তায় গ্যাসের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

অবশেষে মৃত্নু নিশ্বাস ফেলে মাতা বললেন, মেয়েটার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, কতবার যে সব দেখলে !

বাপ চুপ ক'রে রইলেন।

মা বললেন, দেখ না, সেবার নরেশবাবুরা হাঁটালে, বিষ্টুবাবুরা কি সব ব'লে গেল। তারপর জগন্নাথবাবুরা মুখের ওপর 'কালো' বললে।

মা আবার বললেন, ওরা নাকি বলে, আমাদের চেয়ে বাজারে মাছের দর আছে।

নিভার পিতা অন্যমনে শুনছিলেন, শেষ কথাটায় একটু হাসলেন ; বললেন, মিছে বলে না।

খানিক চুপ ক'রে বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা ঘুমোচ্ছে ?

মা বললেন, হ্যাঁ।

রাত্রি গভীর হয়ে এল, ক্লান্ত স্বামী ঘুমোলেন।

নিভার মার চোখে আর ঘুম এল না। মনে হয়, বারে বারেই নব অভিজ্ঞতায় এই একই অভিনয় দেখছেন। অসম্মান, সম্মান, অবমাননা, অত বোঝে না মন ; শুধু একে একে মনে পড়ে কত বিয়ের কথা, জানাশোনা, স্বজন আত্মীয়—কত কথা।

কারও বা গহনা, কারও বা গহনার ওজন, কারও বা গহনার রং, কারও বা নিজেরই রং ; কারও বা তুচ্ছ কথা, কারও দরিদ্র পিতামাতা ; যা হোক তা হোক অমনিই তো হয়ে থাকে। বলে, লক্ষ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না।

ছোট বোন সুধারই তো বিয়ের পরদিন কুশণ্ডিকার আগেই গহনা ওজন ক'রে দেখেছিল তারা। যাট ভরিতে দেড় ভরি কম ছিল। কাঁটা হয়ে ওঠে নি। তাঁদের বাপ গিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁটার ত্রুটি সেরে নিলেন কাঁটা দিয়ে।

হয়তো তখন সুধার মনে একটু কাঁটা ফুটেছিল।

তা হোক। আজ সুধার ঐশ্বর্য্য দেখে কে? ছেলে মেয়ে সুখ ঐশ্বর্য্য ঘর বাড়ি হীরে মুক্তা!

আহা, তা বেঁচে থাক। আহা, বাবা দেখে যান নি।

কিন্তু—

তা কি হবে, এই রকমই তো সব ঘরে!

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমোচ্ছে। মা তাঁর কালো মেয়েটির মুখের দিকে একবার চান। গ্যাসের আলো ঘরে পড়েছে, তারই সামান্য আলোয় দেখা যায়, খোকার গায়ে চাদর নেই, নিভার মাথার বালিশটা কোথায় স'রে গেছে। ঠিক ক'রে দিয়ে মা শুয়ে পড়েন।

আকাশে নিঃস্তব্ধ শান্তি। এক আকাশ তারা ঝিকমিক ক'রে ঘুমের রাজত্বে চেয়ে আছে।

পরদিন বৈকালে ছেলের মা আর অন্য পরিজনরা দেখতে এলেন ভেতরে, আর বাইরে এলেন বাপ, মাতুল, কাকা।

পূর্ব্বদিনের চেয়ে বেশি ক'রে সাবান স্নো ঘ'ষে রংটা অনেকটা খসখসে ক'রে, মাথা ঘ'ষে চুল খুলে মাথাটা মাথার তেলের বিজ্ঞাপনের মতন ক'রে, শাড়ির সঙ্গে জামার রঙে মিল করিয়ে, ভেবে চিন্তে অনেক পরিশ্রমে শ্যামা মেয়েটিকে সবাই সাজাল।

অবাধ্য অপমানবোধ কেবলই নিভার চোখের কোলে উপছে জল পাঠায়। আর দিদিরা ধমক দেয়।

কাকে আবার না দেখেছে, কে আবার না দেখে! তোর রকম দেখে বাঁচি না—চোখ-মুখের কি ছিরি হবে!

মেজদি বললে, বেশ দেখাচ্ছে এবার। নিভার মুখখানি যে বেশ।

যথারীতি প্রণামাদি ও শিষ্টাচারের কথা সমাপ্ত ক'রে মেয়ে দেখা। মেয়ে অন্দরে প্রেরণ করাও হ'ল।

খোশগল্পে আসর জমকে ওঠে। যথারীতি দেশের কি অবস্থা, বেকার-সমস্যা, ঘি-দুধের দুর্মূল্যতা, পাস করার নিষ্ফলতা এবং অ-পাস-করা কেঁইয়াদের উপার্জ্জনে কৃতিত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে এসে ছেলের মাতুল পৌঁছলেন।

বলবেন না মশাই, রাম রাম, কি যে সব হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপার, আমরা তবু রোজগার করিছি, ছেলে ব্যাটারা আর খেতে পাবে না।

পাত্রীর পিতা 'আজ্ঞে হ্যাঁ' ব'লে সমর্থন করলেন। তারপর কন্যাদায় ও তারপর পাত্রপক্ষের নানা রকম অভদ্রতার কথাও ওঠে।

এবার পাত্রীর পিতা কিছু বলতে পারেন না। কে জানে, যদি কারও গায়ে বাজে!

কিন্তু মশাই, আসল ব্যাপার হচ্ছে এই কালোকে ফরসা করতে জানা। মাতুল ডাক্তার, বেশ নাম-করাও। উৎসুক হয়ে শ্রোতারা মুখের দিকে চেয়ে রইল, ভদ্রলোক কিছু ঔষধ বলবেন না কি?

অট্টহাস্যে মাতুল বললেন, তা হচ্ছে মশাই এই—রং অনুপাতে রৌপ্য মুদ্রা, ওষুধ-বিষুধ নয়; এই আমাদের পাড়ায় সম্প্রতি একটি যক্ষ্মা-কালো মেয়ের বিবাহ হ'ল। বাপ বেশ বড় কাজ করে। মেয়ের মুখ তাকিয়ে দিলে মশাই। বলব কি, আট হাজার নগদ দিলে। ছেলেটি

সোনার চাঁদ—যেমন রূপ, তেমনই গুণ। খরচ করলে যেমন, পেলেও তেমনই। বুঝলেন কিনা? মাতুল আবার উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়ে দিলেন। অবশ্য আমরা অর্থাৎ আমার ভগ্নীপতিদের টাকা নগদ নেওয়ার প্রথা নেই; তবে—

বিমূঢ় অপমানিত বেদনায় অনুজ্জ্বলবর্ণা মেয়ের পরিজনরা হাসবার চেষ্টা করলে তাঁর সঙ্গে, পাছে ভদ্রতার লাঘব হয় আর তাতে মেয়ে পছন্দতে ত্রুটি ঘটে।

নিভা ওপরে উঠে এল। এবার মা জলটল খাওয়াবেন ওদের। আর চোখে জল এল না। যা হোক একটা নিষ্পত্তি—এস্পার কি ওস্পার হয়ে চুকে গেলে ও বাঁচে।

এ বাড়ির ও বাড়ির চিনু বিনু রুনু রেবা আশা সব বারান্দায় ছাতে দাঁড়িয়েছে।

নিভা উদাসীনভাবে ছাতের অন্য এক কোণে দাঁড়ায়। গল্পের কথা কানে টুকরো টুকরো ভেসে আসে।

জান ভাই, আমার বেতে পাঁচবার দশবার দেখাদেখি কিছু হয় নি। যেমন শাশুড়ী দেখলেন, অমনই সব কথা ঠিক হওয়া।

তা ভাই, তোমার বাবা যে তেমনই ছ হাজার ক'রে খরচ করে-ছিলেন। তোমাদের ঐ সুধার কেন অত নাকাল?

দেখতে তো সুধা ভাল নয়। আর কাকা তেমন খরচ করলেন কই?

এইবার একটি মুখরা মেয়ের গলা শোনা গেল বেশ জোরে, তা ব'লে তোরা যারা রূপসী তাদেরই সব ভাল হবে? তা হ'লে তোদের লীলার কেন ভাল ঘর বর হ'ল?

সে যে তার বাপের একটিমাত্র মেয়ে, অত বিষয় সেই পাবে। আর কালো, তা মুখখানি কি সুন্দর! স্বামী খুব আদর-যত্ন করে।

মুখরা মেয়েটি শ্যামা, বিদ্রূপ-হাস্যে সে বললে, আই বল, আসল কথা টাকা, তাই মুখখানি ভাল, তাই তার শ্বশুরবাড়ির যত্ন।

যে তর্ক করছিল সে বললে রাগ ক'রে, তা টাকা তো কি? যার বাবার আছে, তিনি দেবেন না?

কেউ হারে না, নানামুখী তর্ক চলে।

রাত্রি হ'ল। অন্ধকারে নিভা একলা ছাতে শুয়ে ভাবে।

মনের এক পাশে দাঁড়ায় আকাশভরা তারা, অন্য ধারে পৃথিবীজোড়া অন্ধকার।

সেদিন দিদি এসেছিল। ওপরে এল তারা।

হ্যাঁরে ন, ওপরে একলা?

নিভা উঠে বসে।

সেই একই কথা। দিদি বেশ ক'রে বসে, সান্ত্বনা দেবে ভাবে, বলে, এমনিই হয়েছে ভাই। সে তাদের পাড়ার কার কন্যাদায়ের নিদারুণ মর্ম্মস্পর্শী ব্যাখ্যা দেয়। আর উপসংহারে বলে, কি করবি, এমনই ঘরে ঘরে।

তারপর মেজদি তার মামাশ্বশুরের শ্বশুরবাড়ির কার এক কৃষ্ণা কন্যাদায়ের ভয়াবহ অথচ উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেয়; অর্থাৎ মেয়েটি বিয়ের পরে নাকি আত্মহত্যা করে। তার উপসংহারে সে বলে, তার চেয়ে আমাদের নিভা দিবা ঢের ফরসা—

রাত্রিও বাড়ে, গল্পও বাড়ে। আসর জমে ভূতের গল্পের মত। নিজ নিজ নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ হৃদয়বান অথচ পিতৃমাতৃভক্ত স্বামীদের বাদ দিয়ে—অন্য সকলের ভদ্রতাহীন বিয়ের কথা বলে। শ্বশুরালয়ের খোঁটার কথা বলে।

নিভা আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকে। বর এবং বরপক্ষীয়দের সম্বন্ধে তার ধারণা তো খুব ভাল হয়ই না, বরং বেশ ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে।

অনেক রাত্রে দিদি গেল ছেলে শোওয়াতে।

চুপ ক'রে থেকে থেকে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, আচ্ছা ভাই মেজদি, মেজ জামাইবাবুরাও তো অমনই করেছিলেন ?

মেজদি সোজাসুজিই বললে, দেনা-পাওনার কথা আবার, কোন্ বিয়েতে না হয় ? হয়েছিল বইকি। তা সে তো আমার দিদি-শাশুড়ী আর শ্বশুর করেছিলেন। উনি তার কি জানেন ?

মেজদির স্বামীকে ভাঁল বলবার সরল প্রচেষ্টায় নিভার হাসি পেল। সে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, তা হ'লেও ভাই, উনি তো মা-বাপের ছেলে, বলতে পারতেন না কি ?

মেজদি বললে, তা কি ক'রে বলবেন ? মাথার ওপর গুরুজন বাপ মা, তাঁরা যা করবেন ভালর জন্যেই তো ? আর এ তো সবাই করে।

নিভা অপ্রস্তুতভাবে বললে, তা হ'লেও অত বিদ্বান জামাইবাবু—

মেজদি বললে, তাতে কি ?

নিভার অন্তরে বিদ্বান পুরুষসমাজের ওপর ঈষৎ শ্রদ্ধা ছিল তখনও। সে ভাবত, বোধ হয় তারা পৌরুষে দীপ্ত, আকাশের মত উদার, অচলের মত দৃঢ়, সমুদ্রের মত গভীর। নিত্যকার ছোট ছোট দৈন্য, ক্ষুদ্রতা, লোভ তাদের স্পর্শ করে না।

আবার সে বলে, আচ্ছা ভাই, তোমার শাশুড়ী নাকি বড় খোঁটা দিয়েছিলেন বাবাকে, তাতেও জামাইবাবু চুপ ক'রে রইলেন ?

তা কি ক'রে বলবেন ?—তুই এক পাগলী। মা-বাপকে বলা যায় ? হ'লই বা শোনালেন আমার শাশুড়ী। তাঁদের হ'ল গিয়ে ছেলে, আমার বাবার মেয়ে! লোকে কত কথা বলে, তাঁরা আর এমন কি বলেছেন ?

বিয়েতে লক্ষ কথা হবে, আর ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষকে বলবে, এই হ'ল ধারা।

যুক্তিসঙ্গত জবাব পেয়ে নিভা চুপ ক'রে গেল।

আকাশের এক প্রান্ত থেকে কৃষ্ণা-তৃতীয়ার বাঁকা সোনার থালার মত চাঁদ উঠল। মা ডাকলেন, ওরে ও মেয়েরা, কত রাত্তির হ'ল, ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে নে না? নিভাকেও খেতে ডাক।

নিভা উঠল।

এবারে সে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা দিদি ভাই, তোমাদের জামাইবাবুদের ভাল লেগেছিল?

তার ষোলো বছর পার হয়ে গেছে, গল্পের বই পড়ারও প্রচুর সময় ছিল, কাব্য-জাগতিক আদর্শ স্বামী সম্বন্ধে কল্পনার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

মেজদিদি উঠছিল, হেসে গড়িয়ে পড়ল, স্বামীকে ভাল লাগবে না? কেন? শোন একবার মেয়ের কথা! হাসিয়ে পাগল করতে পারে ও! মাগো, ওদেরও তো বিয়ে হয়েছিল সব, কই, এসব কথা তো ভাবেও নি! মেজদিদি, দিদি আর মার কাছে এত হাসির কথা বলতে নেবে গেল।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে নিভা দিদিদের ছোট ছেলেদের ঘুম পাড়াতে মার কাছ থেকে নিয়ে এল।

আদর কাড়াতে নিভা পায় না, আদরই পায় নি। দর থাকলে আদর থাকে। বোনেদের প্রথম নয় শেষ নয় সে, আদর কাড়াতে অপ্রস্তুত মনে হয়।

তবু অনেক রাত্রে যখন দিদিরা ঘুমোল, ছেলেরা ভাইয়েরা ঘুমোল, মার পায়ের শব্দে নিভা উঠে বসল। সবাই ঘুমোচ্ছে।

জননীর চোখ পড়ল, কি রে?

একটু জল খাব।—উঠে এসে কুঁজো থেকে জল খায়।

কলকাতার আকাশ ঝাপসা জ্যোৎস্নায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মহানগরীর দিকে চেয়ে আছে। পাড়ার প্রায় সব বাড়িই অন্ধকার।

মা তখন ভাবছিলেন, স্বামীর কাছে গিয়ে কিছু পরামর্শ করবেন, জিজ্ঞাসা করবেন।

নিভা এসে দাঁড়াল কাছে।

কি রে?

আমার ও রকম ক'রে বিয়ে দিও না মা।

কি রকম ক'রে?—মা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

ঐ কেবলই টাকা আর গয়না দিয়ে। আমি ওদের ভালবাসতে পারব না। তার চোখ ছলছল ক'রে এল।

শোন কথা! ওরা টাকা নিয়ে বিয়ে করবে, তার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি? পাগল আর কি! এঁরাও তো টাকা নিয়েছিলেন।—

তাঁর নিজের ভালবাসার কথা মা আর বললেন না।

রাত হয়েছে, যা শুগে।

বাপ জেগেই প্রায় ছিলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, নিভা কি বলছিল?

মা বললেন। নিভার বাপ একটু চুপ ক'রে থেকে একটু হেসে বললেন, তা ভালবাসার ব্যাঘাত হয় না। দৃষ্টান্ত যা দিয়েছ, তার জবাব দেবার উপায় ওর আর নেই, আমারও নেই।

স্ত্রী অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

কথা উল্টে বললেন, ওরা কি বললে? জবাব কবে দেবে? পছন্দ হয়েছে?

স্বামী বললেন, ওরা ব'লে গেল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ওদের, রং ফরসা করার উপায়ও একটা বাতলে দিয়েছে, সেটা হ'লেই ওরা বিয়ে সামনে বৈশাখে দেবে।

উৎসুক নিভার মা জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি উপায়?

কিছু বেশি টাকা। নগদ ওরা নেয় না, কিন্তু রকম নেয়।

খানিক চুপ ক'রে থেকে পত্নী বললেন, তা কি করবে?

তাই দোব আর কি। ছেলেটি ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, বাপের অবস্থা ভাল, বাজারে দর আছে। তা ছাড়া মেয়েকে গয়নাগাঁটি দেবে, আদরও করবে। তারপর একটু থেমে ঈষৎ হেসে বললেন, আর তুমি তো বলেইছ ঠিকই—ভালবাসতে কোনই বাধা হয় না।

জননী

জাজ্বল্যমান সংসার। চার ছেলে, দুই মেয়ে, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রীতে সাজানো, সমৃদ্ধ। ছেলেরা কৃতী—একজন প্রফেসার, একজন ডাক্তার, দুজন উকিল।

সংসার চলে স্বচ্ছন্দে সচ্ছলে; সময় কাটে কাজে কোলাহলে; সুতরাং সাংসারিক অশান্তি শুধু বাক্যের পথ দিয়েই উঁকি মেরে যায়।

মোটের ওপর সব ভাল।

কিন্তু একটি চিরন্তনী গোল ছিল, সেটা ছিল বড় ছেলের মাতৃহীন বালক যোগেনকে নিয়ে।

মায়ের অভাবটি পরিপূর্ণ ক'রে দেবার প্রবল প্রচেষ্টাতে পিতামহী যে প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় তাকে দিয়েছিলেন, সেইটেই পিতামহী আর পৌত্রের দুজনেরই কাল হয়েছিল। দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিরোধ, বচসা যা কিছু উঁকি মারত, তার যবনিকার অন্তরাল থেকে সপিতামহী যোগেকে সকলেই চট ক'রে আবিষ্কার করত।

মার পক্ষপাতিত্ব বাড়ির কাকপক্ষীও দেখতে পাক, এইটে ছিল বাড়ির জনমত।

নানা পথ দিয়ে বিরক্তি আসে, বিরক্তির সঙ্গে বিঘ্নও আসে। মাসের পয়লা থেকে হিসাব-নিকাশের সময়; মুদী, ময়রা, গয়লা, ধোপা, দর্জ্জী তো আছেই; তার ওপর গলির মোড়ের 'সর্ব্বভাণ্ডার' দোকানের চায়ের টিন, বিস্কুটের বাক্স, দেশলাই, মোজা, জামা, শাড়ি, ধুতি, সাবান, কাপড় কাচা সাবান, কাগজ, পেন্সিল, কালি আদি নানাবিধ দ্রব্যের অনাদ্যন্ত বিল আসে। চার বউ, চার বাবুর ইনিশিয়েল সই ক'রে দেন। মুদী

আসে, ময়রা আসে, সর্ব্বভাণ্ডার আসে সরবরাহ নিয়ে। দর্জ্জী আসে গজ নিয়ে ছিট নিয়ে ইত্যাদি।

মাসকাবারি নানাবিধ বিল দেখতে দেখতে কারুকে দিয়ে, কারুকে স্থগিত রেখে, কারুকে ভগ্নাংশ মাত্র দিয়ে, বিরক্ত মুখে বড় ছেলে উঠে এলেন, এই সেদিন আর বছর এত বিছানাপত্র করালে মা, আবার এবার?

অপ্রস্তুত মা বললেন, যশুর জন্যে করতে দিয়েছিলাম।

অপর ছেলেরাও এসে বসলেন।

সেদিনকার গুলো? বিরক্তি জিনিসটা সংক্রামক। বিরক্ত তৃতীয় পুত্র বললেন, সেগুলো কার?

সেগুলো অন্য পৌত্রদের, তৃতীয় পুত্রের মেয়ের, বড় ছেলের ছেলের ইত্যাদির।

জননী নাম করলেন না।

মধ্যম পুত্র বললেন, মা, তোমার কেমন যোগে যোগে বাতিক! সেদিন তো যোগেরও কি একটা হ'ল? আর লেপ?

জননী বললেন, সেটা বালিশ একটা যোগের! এবং একবার বলতে চাইলেন, সে লেপটা যোগেনের নয়, সেটা বিশুর; কিন্তু নিরর্থক হবে জেনে মৌন হয়ে রইলেন।

বড় খগেন্দ্র বললেন, দেখ না, এ মাসে দর্জ্জীর বিলই কত হয়েছে! দুধের হিসেব দিয়ে গেল মতি, চল্লিশ টাকা এবারে দুধের। সবই মোটা অঙ্কে বেড়েছে রে। দশ টাকা ক'রে প্রত্যেকটায় বেশি আছে, কম তো কোনটাতে নয়।

মধ্যম জগদিন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, আমি তো দেখিছি, যেন কিছুই মাত্রা নেই।

পাশের ঘরে বধূরা কন্যারা ছিল, জননী ব্যাকুল হয়ে বললেন, ওরে, এ মাসে যে সব তত্ত্ব-তালাস আনা-নেওয়া মেয়ে-বউমাদের করলাম, জামাইরা এলেন, ভাইদ্বিতীয়া গেল, ছেলেপিলে পাঁচটি এসেছে, খরচ তো হবেই, অত চেঁচাস নি।

আগে? এত কি তখনও খরচ হ'ত?—কনিষ্ঠ পুত্র জিজ্ঞাসা করলে।

মা বললেন, ওরে, এখন যে সব মাগ্‌গিগণ্ডা হয়েছে। মুখে এল—তখন ছেলেপিলে সংসারে সকলের হয় নি; কিন্তু ষাট, সে তো মনেই আনতে নেই, মুখে তো দূরের কথা। তারপর হাসি-অশ্রুতে মিলিয়ে মনে এল তখনকার হিসাব।

কিন্তু তোমরা হিসেব বোঝ না।—তৃতীয় নরেন বললেন।

সকলেই বললেন, সেটা ঠিক।

মা অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

আর যোগেনের বজ্জাতির শেষ নেই, সে খবর তো মা রাখ না। পড়াশোনায় বাবু আজকাল বেজায় স্বাধীন, তুমি ওর মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছ মা।—কনিষ্ঠ পুত্র উষ্ণ স্বরে বললেন।

ষাট ষাট, তোমাদের কি কথা বাবা! কথা কি কইলেই হ'ল?—যশুর পিতামহী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

কনিষ্ঠের কথায় যোগেনের পিতা বললেন, বটে! এদিকে ছোঁড়া বাড়ছে যেন তালগাছ। খাবে আর বজ্জাতি করবে।—বিরক্ত স্বরে ব'লে আপনা হতেই যেন মার দিকে চাইলেন।

খাওয়ার কথায়ই জননীর মনটা পীড়িত হয়ে উঠল। যোগেনের সত্যই সুখাদ্যে আত্যন্তিক রকম রুচি ছিল। মাতৃহীন বালককে পিতামহী কোন দিন সে বিষয়ে কিছু বলেনও নি, এখন কিন্তু অন্যত্র তাকে সুখাদ্যের সঙ্গে খোঁটাও খেতে হ'ত।

খরচপত্র, আয়ব্যয়, পূজার পর কোর্টের কাজ, বাকি টাকা ইত্যাদি, যোগেন এবং অন্য বালক বালিকা, নানাবিধ আলোচনার পর ছেলেরা কেউ ঘরে কেউ বাইরে গেলেন।

স্তিমিতপ্রদীপ আলো-আঁধারের আভাসে ভরা দালানে ব'সে হরিনামের মালাটি হাতে নিয়ে জননী মনে মনে হয়তো বেদনার মালা জপ করতে লাগলেন।

তা তুমি যতই বল সেজবউ, ওর দোষ উনি দেখতে পান না। ওই বুড়ো হাতী ছেলে কি রকম যে করে ছোটদের সঙ্গে, তা মা যদি একটি কথা ওকে বলেন!—মেজবউ বললেন, মেজবউয়ের ছেলের সঙ্গে সেদিন যোগেনের ঝগড়া হয়েছিল।

সেজবউ বললে, মা তো ভাই কারুকেই কিছু বলেন না। তা ছাড়া ওর মা নেই। প্রথমকার নাতি। তার নিজের জননীরও ওই রকম পৌত্রের উপর ঝোঁক ছিল।

নাতি তো সবাই।—মেজবউ গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে ব'লে আরব্ধ কাজে মন দিলে।

পরিবাদ জিনিসটা যতই জনান্তিকে হোক না, যার নামে হয় তার কাছে একদিন এসে পৌঁছয়ই এবং শুধু পৌঁছয় না—অলঙ্কৃত সুসজ্জিত হয়ে আসে।

মা যেন মাটি হয়ে গেলেন।

বার্দ্ধক্য আসে নি, কিন্তু স্থবিরতা এল।

আস্তে আস্তে সংসারের সব কাজ এবং দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে সকালে নিভৃত ঠাকুরঘরের কোণ, আর সন্ধ্যায় শিশুদের রূপকথার মণ্ডল

সৃষ্টি ক'রে, বহু যত্নে বহু আয়াসে পরম মমতায় গ'ড়ে তোলা সংসারকে জননী ছেড়ে দিলেন।

বধূরা মাঝে মাঝে ডাকে, মা, এইটে বলুন, এইটে ক'রে দেবেন। মা মৃদু হাস্যে স্বীকার ক'রে নেন, কিন্তু দরকারের সময় ঠাকুরঘরেই থাকেন।

হিসাব-নিকাশ, গৃহিণীপনার স্রোত তার নির্দ্দিষ্ট পুরাতন প্রণালী না পেয়েও ছোট ছোট নতুন প্রণালী দিয়ে সহজেই ব'য়ে যায়।

মার দিকে চোখ পড়ল সকলের, কিন্তু ধরা গেল না। বুড়ো হয়েছেন? শরীর ভাল নেই? বাঁচবেন না আর? সবাই—ছেলেরা ভাবে নিজের মত ক'রে। মাকে আবশ্যক না থাক, বেদনাবোধ তো আছে। বহুকালের পুরাতন প্রপিতামহীর প্রতিষ্ঠা করা দীঘি, গাছ হঠাৎ শুকিয়ে যেতে থাকে, মনের ভেতর কি যেন অভাব বোধ হয় হয়তো।

ছেলেরা বধূরা সব জিজ্ঞাসা করেন, মায়ের কি চাই? মায়ের যোগের কি চাই? অভিযোগের অনুযোগের ভাবে নয়—আন্তরিক।

যোগের? কি জানি, সবই তো আছে—দেখ 'খন তোমরা। নিজের?—জননী মৃদু হাস্যে বলেন, না বাবা, নিজের আর কি চাই? সবই তো আছে।

সংসার সুনিয়মে চলে। অন্তরে বেদনা কারু বাজে, কারু বাজে না; সেটা আছে হয়তো।

কবে জ্বর হয়েছে জান না?—বিরক্ত বড় ছেলে স্ত্রীকে বললেন।

আমরা কি ক'রে জানব? রোজ নেয়েছেন, পুজো করেছেন, খেতে পারেন না শুধু। আজ সকালে যোগেন এসে বললে, ঠাকুমা ডাকছেন,

জ্বর হয়েছে। তাই টের পেলুম। আমাকে বললেন, ঠাকুররা উপসী থাকবেন, তাই পুজো করতে।—যোগেনের বিমাতা উত্তর দিলেন।

চল, দেখে আসি, তোমরা আশ্চর্য্য মানুষ!—বড় ছেলে বেরিয়ে এলেন।

একে একে চার ছেলে সব এসে বসলেন। জননী চুপ ক'রে শুয়ে ছিলেন, যোগেন পাশে ব'সে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

বড় ছেলে মার মাথায় হাত দিলেন। ডাক্তার-ভাইকে ডেকে বললেন, সতু, দেখ, জ্বর বেশ।

জননী, ছেলের হাতখানি মাথায় সুশীতল মনে হওয়ায়, 'আঃ' ব'লে বললেন, না, জ্বর বেশ কোথায়? এই গায়ে কেমন বড্ড ব্যথা, তাই আর উঠি নি। তোরা মিছে হৈচৈ করছিস।

সকালবেলা হৈচৈ বলা সত্ত্বেও বিকালে চোখ আর মায়ের খুলতে চাইল না, আচ্ছন্ন হযে শুয়ে রইলেন।

দিন তিনেকের মধ্যে ওষুধে টিউবে ইন্‌জেক্‌শনের সাজ-সরঞ্জামে বিষে উত্তেজকে ঘরের টেবিল টুল ভ'রে গেল।

স্তব্ধ আচ্ছন্নমুখ জননীর মুখপানে চেয়ে ছেলেরা আসা-যাওয়া করেন, বারবার জিজ্ঞেস করেন, মাকে ওষুধ দিয়েছ? দুধ? আঙুরের রস? কতটুক ক'রে দাও? লেখ না কেন?

অর্থ, ব্যাকুলতা, সেবা নিরর্থক শত পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়; যাঁর জন্য, তিনি কিছুই জানতে পারেন না।

ও মা, মা? দিদিকে আজ আনতে পাঠাব? ছোড়দি এসেছে।

জননী একবার চোখ খুলে বললেন, আচ্ছা।

যগু ঘুরে-ফিরে আসে, সেই ঘরে বেড়ায়, তার আকুলতা কারুর চোখে লাগে না। রাত্রে সবাই বিশ্রামের জন্যে একটু শুলে সে পিতামহীর

বুকের কাছে মাথাটা আনে, তিনি অজানতেই ক্ষণচেতনে একবার তার মাথার ওপর শীর্ণ হাতখানি রাখেন।

তারপরেই আবার চোখ বুজে নেন, নয়তো আপন মনে কি সব বলতে আরম্ভ করেন।

কর্ম্ম-অবসরে ছেলেরা এসে বসেন; মনের বিস্মৃত কোণ থেকে বাল্য-কাল, জননী, খেলাধুলা, আবদার, প্রশ্রয় থেকে আরম্ভ ক'রে সেদিনের সম্প্রতির ছোট ছোট কথা বাদানুবাদ বিসর্পিতগতি বেদনার বার্ত্তা ব'য়ে এসে দাঁড়ায়; আঘাত? মাকে? মন স্তব্ধ হয়ে থাকে, জবাব দেয় না। তর্ক? দুঃখ দেওয়া? যোগের জন্যে? কই, না তো। কিন্তু যোগের জন্যে মা তো আর কিছুই কোন দিন বলেন নি। জননী কি আর সংসারের মাঝে ছিলেন না?

রোগিণীর ম্লান বিশীর্ণ মুখের পানে চেয়ে চোখ ভ'রে আসে, সকলেই আপনার কাছেই আপনার অন্তর গোপন ক'রে নিতে চায়।

মাকে যত্ন করবার, জিজ্ঞাসা করবার, শুধু ডাকবার একটা আকাঙ্ক্ষা অন্তর মথিত ক'রে ওঠে; কারণে অকারণে ছেলেদের আসা-যাওয়া জিজ্ঞাসার বিরাম নেই; শুধু জননীর চেতনা কখনও অল্পমাত্র সাড়া দেয়, কখনও দেয় না।

পিসীমাদের চতুর্থী সারা হ'তে না হ'তেই ছেলেদের মাতৃদায়ের আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

খাট, পালঙ্ক, সাটিনের বালিশ, সুদৃশ্য ছিটের লেপ তোষক, নেটের মশারি, ঘড়া, গাড়ু, তৈজসপত্রে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ভ'রে গেল।

চার ছেলের চারটি ; পৌত্রদের মধ্যে বড় এবং পিতামহী অত্যধিক ভালবাসতেন ব'লে যোগেনেরও একটা ষোড়শ।

পিসীমাদের, জননীদের, বাপ-কাকাদের নিরবসর দিন। জননীকে কেন্দ্র ক'রে যে আয়োজন, তাতে জননীকে স্মরণ করবার অবসর নেই। শুধু ক্ষণে ক্ষণে অভ্যাগত কুটুম্ব সমাগমে সকলের মনের গোপন ব্যথিত অংশ একবার দেখা দিয়ে যায়।

যণ্ড কি করে, খায়, না খায়, কোথায় থাকে, কি ভাবে থাকে লক্ষ্য করবার সময় কেউই পায় না। মাঝে মাঝে ছোট কাকা এক একবার তাকে ডাকে ; ঝ'ড়ো কাকের মতন রুক্ষ চুলে, দীর্ঘ শীর্ণ দেহে, সাদা উত্তরীয়ে থানে, কিম্ভূতকিমাকারদর্শন বালক ; আহ্বান করলে মুখে দীন ম্লান অপ্রতিভ হাসি ভেসে ওঠে একবার, চোখে জল এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

তৃতীয় প্রহর শেষ হয়ে এসেছে, ডাক পড়ল, যণ্ড, ওরে যোগে, যোগে কোথা ? ডাক ডাক, কাজ আরম্ভ ক'রে দিক।

সুসজ্জিত সভামধ্যে কীর্ত্তনের আসরে কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধু স্বজনের সংখ্যা ছিল না।

কে এক ভৃত্য শীর্ণ, দীর্ঘকায়, তেরো বৎসরের বালককে ডেকে আনলে। কোথায় ছিলি ? আয় আয়।—পিতা আহ্বান করলেন।

বিস্ফারিত চোখে বালক জিজ্ঞাসা করলে, কি ?

আসনে ব'স।

পুরোহিত বললেন, এই যে এইখানে বাবা।

যণ্ড বললে, কি করব ?

তোকে যে ঠাকুমার দান উৎসর্গ করতে হবে—এই সব।—সুসজ্জিত দ্রব্যাদি দেখিয়ে পিতা বললেন।

বালক আশ্চর্য্য হয়ে বললে, কাকে ?

আঃ, ব'স না, ঐ মন্ত্র পড় না।

নির্ব্বোধের মত খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে দু একটা উৎসর্গের মন্ত্রপাঠের পর কুশের আংটি শ্বেত উত্তরীয় ফেলে লুটিয়ে প'ড়ে সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, ওরে ঠাকুমারে, তোমাকে ওরা তখন কেন এই সব একটাও দেয় নি রে—

কীর্ত্তনের আসরেই জনতা বেশি ; দু-একজন এদিকেও ছিল, তারা আর তার বাপ-কাকারাও ছুটে এলেন, কি রে ? কি হয়েছে কি ? কাঁদিস কেন ?

বালক ততক্ষণে চোখ মুছে স্তব্ধ হয়ে উঠে বসল।

কি হ'ল কি ? জবাব দেয় না। এই ?—পিতা রেগে উঠলেন।

অন্য পাঁচজন বললে, আহা, ওর মন কেমন করছে। ছোট কাকা নীচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি রে যগু ?

যগুর টপটপ ক'রে ধারা ব'য়ে চোখ থেকে জল পড়তে লাগল, মৃদুস্বরে সে বললে, তখন তো কেউ তোমরা ঠাকুমাকে এই সব কিছুই দাও নি ! খালি সবাই রাগ করতে।

বালক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আমি মরা ঠাকুমাকে দিতে চাই না।

ছোট কাকার চোখ ভিজে উঠল, চার ভাই স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

আগাছা

১

পিঁপড়ে, পতঙ্গ, মাছি, মশা, ছাগল, গরু, মুরগী, মানুষ, কুকুর, বেরাল যেখানে এক জায়গায় একসঙ্গে বাস করে, মনোরমার ছেলে সেই রকম একটা জায়গায় ঘুঁটে, কাঠ, টিন, কয়লা, ভাঙা হাঁড়ি, কলসীর টুকরো নিয়ে খেলা করছিল।

এক টুকরো ঘুঁটের একটুখানি মুখে পুরে সে ফেলে দিলে, তারপর হাত বাড়িয়ে একটা পিঁপড়ে ধ'রে মুখে পুরলে এবং তারপরেই কাঁদলে।

এবারে শশীর মা এল। মুখ থেকে পিঁপড়েটা টেনে বার ক'রে ফেলে দিয়ে একবার কোলে তুলে নিলে। তারপর সামনের ঘরের একটি মেয়েকে ডেকে বললে, একটু দেখিস তো মা একে, একবার ঘুরে আসি মনিব-বাড়ি।

খোকা একলা ব'সে এক টুকরো মিছরি চুষতে থাকে, নয়তো একখানা বাতাসা, তারপর আপনি ঢুলতে থাকে। তখন শশী বা অন্য কেউ কোন ঘরে তাকে তার মাদুরের ওপর একটা কাঁথা বালিশ দিয়ে শুইয়ে দেয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে ঠোঁট চুষতে থাকে আস্তে আস্তে, যেন মায়ের কোলে ঘুমোচ্ছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ঘরে ঘরে কেরোসিনের ডিবিতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্ব'লে ওঠে। শশীর মা কাজ থেকে ফেরে এক বাটি দুধ হাতে, ছেলেটাকে খাওয়ায়। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে, কেঁদেছিল? নয়তো দুষ্টুমি করেছিল? ওর যেন মায়া হয়।

তারপর কোলে ক'রে দুধ খাওয়ায়, কখনও বা আদর ক'রে 'যাদু সোনা দুধ খা' বলে।

কিন্তু শশীর মা মনোরমা নয়; মনোরমা বা ছেলেটার মা একজন ছিল।

পিতৃ-পরিচয়? সে কথা থাক।

তার মার বা মনোরমার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সে বিয়ের ঠিক কোন ইতিহাস জানা নেই। সম্ভবত তেরো চোদ্দ বছর বয়সে বিবাহ তার হয়। সে বিবাহের আধিভৌতিক প্রয়োজন তার বরপক্ষে ছিল না, যেহেতু তাঁর সগৃহস্থালী একটি গৃহিণী ছিলেন। কন্যাপক্ষেও বিবাহের দায়িত্ব ছিল না, তাকে শুধু কন্যকা নাম থেকে নামান্তরিত করা হয়েছিল।

সুতরাং বিয়ের আগেও সে যেখানে ছিল, সেখানেই র'য়ে গেল—তার মার কাছে। মা ছিল কোন্ দূর এক আত্মীয়ের বাড়ি রাঁধুনী। ওরা ছিল দুটি বোন, বড়র বিয়ে আগেই হয়েছিল, সে স্বামীর ঘরে থাকত। ছোটর জন্য মার চিন্তার সীমা ছিল না, বিবাহ দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণের মেয়ে, বিবাহ-সংস্কার না হ'লে সে ব্রাহ্মণই নয়, তার হাতের অন্নজল কে গ্রহণ করবে? অতএব বিবাহ তার হয়েইছিল, এবং সেই বিয়ের চিহ্ন ছিল—তার কপালে সিঁদুর।

মা যথাকালে স্বর্গারোহণ করেছিলেন, এবং নির্লিপ্ত নির্ব্বন্ধন বিবাহিতা মেয়ে মায়ের রান্নাঘরের কাজের উত্তরাধিকার পেয়েছিল।

তারপর আশ্রয়দাতার বাড়িতে থাকতে থাকতে একদিন সেও যত কাঁদলে, বাড়ির গৃহিণীও ততই কাঁদলেন।

তারপর? তারপর অনেক কথা। সেই তারপরের একটা স্তরে দেখা গেল মনোরমার ঐ ছেলেকে। তার মাঝের, আগের এবং পরেরও ইতিহাস কেউই প্রায় জানে না, অতএব প্রায় অজ্ঞাতই আছে সেটা।

যা হোক, তার পরেও দেখা গেল, মনোরমার ছেলে, তার চাকরি আর আত্মমর্য্যাদা, তিনই পৃথক পৃথক ভাবে এক রকম ক'রে টিকে আছে।

২

আগাছা যেমনভাবে সতেজ হয়ে বাড়তে থাকে, অযত্নে অশ্রদ্ধায়ও তাড়াতাড়ি পুষ্ট হতে থাকে—বাইরের স্নেহজল তার জন্যে না থাকলেও মাটির স্নেহস্তন্যসুধা টেনে নিয়ে; মনোরমার ফেলা তেমনিভাবেই মাতৃস্তন্য আর মাতৃস্নেহহীন হয়েই শুধু অন্য দুটি জননীর অন্তরের করুণারস আকর্ষণ ক'রে নিয়ে বড় হতে লাগল।

বাতাসা, খই, মিছরি, মুড়ি, ঘুঁটে, খোয়া, কাঁকর, কয়লা সবই তার সমান খাদ্য, শুধু কোনটা সে খায়, কোনটাকে মুখে দিয়ে ফেলে দেয়।

তাকে সশঙ্ক স্নেহে আগলাবার, মধুরস্নিগ্ধ আনন্দময় কৌতূহলে দেখবার, অথবা সেই আহার্য্যের কৌতুকলীলা দেখে হাসবার কেউ নেই।

বিশ্বপ্রকৃতির সন্তানের মত সে যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই হাসে, কাঁদে, খায়, ঘুমোয়। সেই নিয়মেই কখনও বা সে পিঁপড়ে পোকা ধ'রে কামড় দেয়, কখনও বা পিঁপড়ে পোকারা তাকে কামড়ায়।

ধূলোমাখা দেহ, হৃষ্টপুষ্ট, ঈষৎ-মলিন গৌরবর্ণ ভূ[illegible]রের ছেলেটি এই জীবনযাত্রার মধ্যে থেকেই একটির পর একটি ক'[illegible] বছর অতিক্রম ক'রে পাঁচ বছরে পড়ল।

মনোরমার মনের কথা কেউ জানে না। সম্মান ও আশ্রয় তার বজায় ছিল, তারপরেও ছেলের কথা সে হয়তো ভাবে নি, অথবা

ভেবেছিল গোপনে, তা জানা নেই। সে নির্ব্বিঘ্নে রেঁধেছে, বেড়েছে, খেয়েছে, ঘুমিয়েছে।

বাড়ির যিনি গৃহিণী ছিলেন, তিনি সন্তানের জননী, কি ভেবে কি জানি, তিনি ওই মা ও স্বজন পরিত্যক্ত বঞ্চিতকে, ওঁরই ঘরের শিশু ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন।

মনোরমার ছেলে কর্পোরেশনের অবৈতনিক স্কুলে ভর্ত্তি হ'ল। জামাকাপড় তার জোটে। খাতাপত্র শ্লেট বইও পায়। আধা-ভদ্র আধা-বস্তিবাসী ধরনে সে পড়ে। তার পালিকা মা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসিয়ে দিয়ে মনিব-বাড়ি যায় কাজ করতে।

শশীর মার মেয়ে-জামাই ঘরে থাকে। শশীকে সে দিদি বলে। শশীর মাকে মাও বলে, মাসীও বলে।

৩

আপন সন্তান ও পরের সন্তান মানুষ করার যে প্রভেদ থাকে, এক্ষেত্রেও তার অভাব ছিল না। দয়া ও কর্ত্তব্যের দায়ে যে মানুষ হয়, সে মাসীকে মা বললেও, জানতে পারে তার জীবনযাত্রার ধরনটা। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। পালিকা মাতার ভদ্রলোকের ছেলে মানুষ করার ক[র্ত্ত]ব্যর দায়ে, ফেলা দিনের বেলা ওই সব পল্লীর ছেলেদের মত সব সময় [খেল]া করতে পায় না; অশ্রাব্য অকথ্য কথা শুনতে পায়, কিন্তু বলতে [পা]য় না; গাল দেওয়া, মারামারি করায় এগোতে পায় না। নিজেদের মা[দে]র স্নেহসজাগ দৃষ্টিতে থেকে পাড়ার ছেলেরা যা খুশি তাই করে, বলে; কিন্তু মাসীর তীক্ষ্ণ সচেতন লক্ষ্যের মাঝে থেকে ফেলার লেখাপড়া, খেলার, শোয়ার সময়ের বেশি নড়চড় হয় না।

ফলে সকলেই জানতে পারলে, ও ওদের ছাড়া বিশেষ কেউ, হয়তো ভদ্রলোকের ছেলে। বোঝা যায়, ওর জন্যে খরচের টাকা আছে, খবর করার লোক আছে।

বয়স আস্তে আস্তে জ্ঞানের সীমায় এসে পৌছল।

সঙ্গী ছেলেগুলো কেউ কেউ বলে, তুই তো বড়লোক হবি। তুই ভদ্রলোকের ছেলে, পাস করবি।

আর একটা ছেলে বলে, হ্যাঁরে, তোর মাসীর অনেক টাকা আছে, না? তোকে জামা কিনে দেয়, জুতো দিয়েছে সেদিন।

অন্য একটা ছেলে বলে, করে তো ঐ গোঁসাইবাড়িতে কাজ, তা আর মাইনে কত! কি ক'রে তোকে ওসব কিনে দেয় রে?

ফেলা বড় হয়েছে, যেন একটু গর্ব্বিত হয় মনে মনে, মুখে বলে, কেন? তোদেরও তো জামা আছে, জুতো আছে।

তোর মতন তো নয়।

গর্ব্বিতভাবে ফেলা চুপ ক'রে রইল। হ্যাঁ, ওরই এই বস্তির মধ্যে অবস্থা ভাল, পয়সা আছে ওদের।

একটা ঘুঁটেওয়ালীর ষোল-সতরো বছরের মেয়ে একটু দূরে দিনান্তের শুকনো ঘুঁটে জড় করতে দেওয়াল থেকে খুলছি· সে একটু হাসলে, জানিস নি তোরা? ও যে শশীদের মার ব[illegible]দের পুষ্যিপুত্তুর হয়।

তার কথায় তার পাশের একটা মেয়ে একটু হাসলে [illegible]

ফেলা ওদের হাসি বা শ্লেষের অর্থ বুঝতে না পেরে[illegible]অন্য ছেলেদের ডাণ্ডাগুলি মার্ব্বেল খেলার দলের মধ্যে মিশে গেল[illegible] সন্ধ্যের আর দেরি নেই, তারপরেই বস্তির পথ ঘোর অন্ধকার। প[illegible]ন খেলা তো দূরের কথা, পথের কিছুই দেখা যায় না।

কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই একটা ঘর থেকে ডাক এল, ফেলা, ও খোকা, ঘরে আয়।

ফেলার জুতো-জামার ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষাকাতর বালকেরা বললে, ওরে, ও ভদ্দরলোক হয়ে পড়া করতে গেল, খেলবে না।

কবছর গেছে। ইতিমধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সাঙ্গ ক'রে, কেউ বা আগেই, ফেলার সব সঙ্গীরা—বস্তির ছেলেরা কলে, কারখানায়, আপিসে, লোকের বাড়িতে মজুরিতে ঢুকেছে।

ফেলা সকলকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়ে তাদের পুরোনো সংশয় বাড়িয়ে দিয়ে হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে।

এ স্কুলে মাইনে লাগে। মাইনে দিয়ে লেখাপড়া ক'রে ও করবে কি? বস্তির মেয়েরা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ মাসী, কত মাইনে লাগে? মাসী হাসে, তার মানে, তা লাগুক। এবং এখন মাঝে মাঝে শশীর মা বলে, যা তো বাবা, ওবাড়ির মাঠাকরুণের ঠেঁয়ে তোর ইস্কুলের মাইনেটা নিয়ে আয়। তেনাকে পেন্নাম করিস।

চোদ্দ পনর বছরের ফেলা গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়ায়। কিন্তু গৃহিণী চোখ তুলে না [illegible]য়েই টাকা দিয়ে দেন বা দিতে ব'লে দেন। মনে তাঁর অস্বস্তির সীমা [illegible]কে না।

মনোরমা [illegible]ন্নাঘরের দরজার পাশ থেকে একদিন মাত্র দেখেছিল। আর দেখতে [illegible]সই করে নি, কিংবা লজ্জায়ই দেখে নি, বলা যায় না। কিন্তু দুটি জন[illegible]ই যেন অস্বস্তির শেষ ছিল না।

ফেলার [illegible] যে সময়ে অদৃশ্য রহস্যজগতের চাবিবন্ধ দরজা একটি একটি ক'রে খুলে দে[illegible] উদ্যোগ করছিল, আর এই স্কুলের সঙ্গ ও আবেষ্টন যখন ফলহরি দাসকে ভদ্রজীবনের ভদ্রসমাজের সামনের যাত্রাপথের দুরাকাঙ্ক্ষায়

দিক দেখিয়ে দিচ্ছিল, এমনতর সময় ও বাড়ির গৃহিণী বিষম অসুখে পড়লেন এবং হাওয়া বদল করতে গেলেন তার কিছুদিন পরেই। তারপর আর ফিরলেন না।

তিনি ফিরলেন না বটে, কর্ত্তা কিন্তু ফিরে এসে কিছুদিন পরেই তাঁর স্থান পূর্ণ ক'রে নিলেন।

নতুন গৃহিণী এসে সংসারের হাল শক্ত হাতে ধরলেন। নতুন বাজেটে ব্যয়সঙ্কোচ-সমস্যা প্রথামত জাগল। ঝি-চাকরের খাটুনির ওপর বসল ট্যাক্স, অর্থাৎ তাদের কাজ বাড়ল, লোক কমল। খরচ বাঁচল তাতে কিছু, এবং স্বভাবতই মনোরমার ছেলের জন্যে যে খরচা সংসারে বরাদ্দ ছিল, সেটাও বাঁচানো হ'ল। ছোটলোকের ছেলের পড়ার জন্যে, বিশেষ ক'রে ঝিয়ের বোনপোর জন্যে (ছেলে হ'লেও বা হ'ত) এত শিরঃপীড়া কি জন্যে, মানেই হয় না।

সংসারের হিতৈষী-হিতৈষিণী দু একজন ছিল, তারা বললে, ঐ রকম। তিনি কিছু বুঝে-সুঝে করেন নি কখনও, করলে কলকাতায় বাড়ি হয়ে যেত।

শশীর মা বাড়ি এসে বললে, খোকা, আর প'ড় না। এবারে কাজকর্ম্ম কর।

ফেলা সবিস্ময়ে বললে, সে কি মা! আমি আর তিন বছর পড়লেই একটা পাস হয়ে ভাল কাজ পাব। ততদিন পড়ি। স্কুলে পড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহ ভদ্রলোকের ছেলের মত তাকেও আকৃষ্ট করেছিল।

দুঃখিতভাবে শশীর মা বললে, আমাদের ঘরে এতেই কাজ হতে পারে। আমারই কাজ থাকে কি না ও বাড়িতে গিন্নী গিয়ে!

গিন্নীমার জন্য ফেলার দুর্ভাবনা ছিল না। সে শুধু বললে, তা হ'লে তোমাদের ঘরে আগে পড়িয়েছিলে কেন?

ওর চোখে জল আসে। শশীর মারও কষ্ট হয়।

পড়ার নেশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুরাশা ফেলাকে ছাড়ে না। ফেলা খুঁজে খুঁজে চাকরি নিলে।

এক চায়ের দোকানে দুবেলা বাটি-বাসন ধোয়া, চা দেওয়া, শরবৎ দেওয়া সকাল থেকে দশটা পর্য্যন্ত, বিকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত।

ইস্কুল ছাড়ার দরকার হ'ল না।

যে জ্ঞানের কুঞ্চিকা ওর মনের চোখের সমুখে কল্পলোকের দু একটি দরজা একটু মাত্র ফাঁক ক'রে দিয়েছিল, এবারে ওর প্রতি একেবারে অন্ধ, নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত আবেষ্টনে চায়ের দোকানের খদ্দেরদের আলাপ-আলোচনায় তার চেয়ে অনেক বেশি ওকে—ওর মনকে—ওর দুরাকাঙ্ক্ষাকে অভিভূত ক'রে তুললে।

যারা চা খেতে আসে, তারা যেন ওর মনে বায়োস্কোপের মত কল্পনা জাগায়, রোমাঞ্চ জাগায়। ওরা কত রাত্রি অবধি গল্প-আলোচনায় ম'জে ডুবে থাকে, মাঝে মাঝে একটা ক'রে হাসির প্রবল উচ্ছ্বাস জেগে উঠে ফেটে পড়ে। তার পরেই ডাক আসে, ফলহরি, আর পাঁচ কাপ চা দাও, শিগ্‌গির।

রূপকথার সঙ্গে ফেলার পরিচয় নেই, কিন্তু যা যার পক্ষে অসম্ভব, তাই তো ওর কাছে রূপকথা। এই রূপকথা তার সর্ব্বাঙ্গ শোনে। বাইরে প্রকাশ্য সে শুধু চা করে, চা দিয়ে যায়, নিঃশব্দ নত মুখে। হাতকাটা [illegible]আ পরা, সাবানকাচা ধুতি কোমরে জড়ানো, আধ-ফরসা রং, অতি সাধারণ মুখ, নীচু মুখে শুধু কাজ ক'রে যায়, সর্ব্বাঙ্গ আর সব মন দিয়ে শোনে এবং ভাবে ওদের কথা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগ, বাজার-দর, বেকারদের কথা, স্বর্ণমান-সমস্যা, নব্য রুশ, উদিত জাপান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য,

নূতন বিলিতী বই, ছিটকে ছিটকে ওর কানে আসে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে, ওর চারধারে হীরার মত, আলোর মত ঠিকরে পড়তে থাকে।

একটি কথাও দাঁড়িয়ে শোনবার জো নেই, কান পেতে শোনার ইচ্ছার সঙ্গেই হুকুম আসে, আর দু পেয়ালা চা। আচ্ছা, দু কাপ কোকো আরও।

সূর্য্যাস্তের সময়ের ছেঁড়া রঙিন মেঘের মত ওর মনের আকাশে ছেঁড়া কথার টুকরোর ঐশ্বর্য্য মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য জমা হয়। ওর মন সে ঐশ্বর্য্য কুড়িয়ে নিতে চায় বৃথাই। এই অসম্পূর্ণ কথা শোনার ফলে বালকের অর্দ্ধেক শোনা রূপকথার বাকি অর্দ্ধেকটা নিজেই রচনা করতে চায় বৃথাই। চা কোকো পৌছয়। কানে আসে, ছোকরাটি কাজের আছে হে।

হ্যাঁ, বেশ চটপটে।—জবাব দেয় দোকানের কেউ।

চৌবাচ্চা থেকে বালতি ক'রে জল তুলে ও এঁটো পেয়ালা-পিরিচগুলো ধুতে থাকে। তার অভিভূত বর্ত্তমান তার অনাসক্ত ভবিষ্যৎকে জানে না, চেনে না, শুধু বীজমন্ত্রের মত সে নামগুলি জপ করে। কে গোর্কি, কে শেকভ, কে জওহরলাল, কে বিবেকানন্দ, ও জানে না কাউকে—নামের পর নাম—মনের পথে শু[illegible] নামের পায়ের চিহ্ন পড়ে; আর কোনও ঠিকানা জানা নেই। [illegible]ঠিন উচ্চারণে অপরিচিত নাম, মহাত্মা, রবীন্দ্রনাথের মত অত্যন্ত [illegible]া শোনা নাম, শুধু নামই—নামেরই লেখা পড়ে, কাপ-সসারগুলো ধুয়ে [illegible]য় চৌবাচ্চার ধারে মিলিয়ে মিলিয়ে সাজায়। মনের নামের সঙ্গে যেন [illegible]তের কাজের ছন্দ মিলে যায়।

যখন ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায় একটা চরম সীমায় এ[illegible]ছে, অর্থাৎ ও ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন বা[illegible] গিয়ে ফেলা

দেখলে, শশীর মার ঘরে তার মনিব-বাড়ির রাঁধুনী-ঠাকরুণ এসে শুয়ে আছে।

রাঁধুনী-ঠাকরুণকে সে চিনতও না, শুনলে যে, সেই।

একে পড়ার জায়গা নেই, তাতে রাত্রের ঘুম ও পড়ার নিশ্চিন্ত নীবরতাকে একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়ে তার স্বপ্নের ধ্যানের একটি মাত্র জায়গা—ঐ ঘরে মূর্ত্তিমান বিঘ্নস্বরূপ মনোরমার বিছানা হয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ও কে?

শশীর মা বললে, ও বাড়ির বামুন-মেয়ে। জ্বরে ধুঁকছিল, ওরা সব বাড়ি বন্ধ ক'রে হাওয়া খেতে গেছে, বললে, তুমি অন্য কোনখানে যাও। কোথায় যাবে, কাঁদতে লাগল, তাই নিয়ে এলাম। বামুনের ঘরের ভদ্রলোকের মেয়ে।

অতিশয় বিরক্ত মুখে ফেলা বললে, তা তো বুঝলাম, আমি পড়ব কোথায়?

ঐখানেই পড়িস না! কতটুকু বা থাকো বাছা ঘরে, ইস্কুলে আর কাজেই তো কাটে।

আমি তা[illegible]লে ওখানেই শোব।—ফেলা বললে।

তারপর [illegible]ক্তভাবে বেরিয়ে গেল।

মনোরমা[illegible]ব শুনতে পেলে। লজ্জায় কাঠ হয়ে আচ্ছন্নের মত চোখ বুজে সে শুয়ে[illegible]ল। যতদিন বাড়িতে পুরনো গৃহিণী ছিলেন, ততদিন ডাক দিয়ে [illegible]জ নিতেন, আগলাতেন, দয়া করতেন। তার জন্যে তাঁর থাকত ভাবন[illegible]দায়িত্ব, মনোরমার ছিল: ভয় সঙ্কোচ। বাড়ির আশ্রিত মেয়ের মত[illegible]তার অবস্থা ছিল। নতুন গৃহিণীর তাকে আশ্রয় দিয়ে আগলাবার দ[illegible]য়ের কথা ভাবতে হয় নি, সেইজন্যে প্রচুর অবজ্ঞা নিয়ে তাকে দেখত[illegible]। তারপর যখন শরীর তার মাঝে মাঝে খারাপ হ'ত,

তখন কৰ্ম্মিষ্ঠা নতুন কর্ত্রী তাকে রাখার কোন দরকারই মনে করেন নি। এমনতর সময়ে মনোরমারও অসুখ হ'ল, ওদেরও বেড়াতে যাবার কথা উঠল ছুটিতে, তখন বন্ধ বাড়িতে মনোরমাই একমাত্র সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কর্ত্তা প্রস্তাব করেছিলেন নিয়ে যাবার। আগের ছেলেমেয়েরাও বলেছিল, কিন্তু হঠাৎ নতুন কর্ত্রী কর্ত্তার ওপর করলেন সকোপ শ্লেষাত্মক উক্তি প্রয়োগ, আর মনোরমাকে বললেন, তোমার তো রোজই অসুখ, তুমি দেশে তোমার বোনের কাছে চ'লে যাও, আমরা খরচ দিচ্ছি। আমার রাঁধবার লোকের দরকার নেই। *

জবাবের অপেক্ষা না রেখে তিনি টাকা এনে হাতে দিলেন, উদারতা দেখিয়ে দু এক টাকা বেশিও দিলেন। সকালের গাড়িতে তাঁরা বিদেশ-যাত্রা করলেন, বিকালের লোকাল ট্রেনে ওকে চ'লে যেতে আদেশ দিলেন। বললেন, শশীর মা দেশে পৌঁছেও দেবে দরকার হ'লে।

বিকালবেলার দিকে দুর্ভাবনায় ক্লান্তিতে জ্বরে অভিভূত হয়ে মনোরমা শশীর মার ঘরে এসে বিছানা নিলে। ওর দেশ, ওর দিদি, ওর স্বজন, ওর আত্মীয় বন্ধু কাউকেই ওর জানা নেই। পৃথিবীতে [illegible] কোনও কূল বা কিনারা নেই। উত্তরাধিকারে পাওয়া কাজ—রান্নাঘর, [illegible] ওর সব। ওর মোহ, ওর দুর্ব্বলতা, ওর ভয় আশ্রয় সমস্তই ওই বাড়িখানি [illegible], আর কোথায় ও যাবে? রোগের চেয়ে ভাবনায়, অপরিমিত পৃথিবী[illegible]য়ে সে আচ্ছন্ন হয়ে প'ড়ে রইল দিনের পর দিন। ফেলার বিরক্তিসত্ত্বে[illegible] তার শিগগির সেরে ওঠবার বা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাবার কোন লক্ষণই [illegible]খা গেল না।

উপরন্তু ফেলার দু আনা [illegible]এক আনা বকশিশ চ[illegible]র দোকানের মাহিনার ওপর, যেটা সে শশীর [illegible]কে দিত, তাও সব খর[illegible]হয় ওই রোগীর জন্যে, শশীর মা চেয়ে নেয়। সুতরাং শশীর মার ওই ক[illegible]-বোনের ওপর ফেলার বিতৃষ্ণার সীমা থাকে না।

সাত আট দিন ধৈর্য্য ধ'রে সে একদিন রাত্রে খাবার সময় শশীর মাকে বললে, ঘরটা জোড়া ক'রে রেখেছ, পড়তে পাই না, শুতে পাই না, এগজামিন আসছে। খরচও বলছ কুলোচ্ছে না, আমায় হাতে খাবার পয়সাটিও নেই। ও কবে যাবে? তুমিই তো ওর খরচ যোগাচ্ছ?

শশীর মা বললে, তা কি করব, আর কে খরচ করবে, ওর নেই যখন? মানুষটা মরতে বসেছে—

তাই ব'লে আমরা করব কেন?—ফেলা বিরক্ত হয়ে উঠল।

এবারে শশীর মাও বিরক্ত হয়ে উঠল, তা দয়া ক'রে করলেই বা।

আমি করব না দয়া।

তোর মা, তুই করবি না দয়া, আমিই সব করব?—বিরক্তিতে রাগে শশীর মার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

পাতের ভাত ডাল দিয়ে মাখতে মাখতে শশীর মার মুখের দিকে সে হতবুদ্ধিভাবে চাইলে, না, ঠাট্টা নয়, মিথ্যাও নয়, সত্য কথার স্বর আলাদা হয়। [illegible]তের ডাল ভাত মাছ সব একাকার হয়ে মিশে গেল ঝাপসা চোখের [illegible]মনে। আলোর কুপিটার শিখা যেন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে অনেক [illegible] হয়ে উঠল, চোখের সামনে অনেকখানি জায়গা রাঙা ক'রে তুললে [illegible] এক নিমেষের মধ্যে বাড়িঘর, শশীর মা, মনোরমা, তার স্কুলে প[illegible] খরচ, বাল্য-সঙ্গীর ঈর্ষা, আলোচনা সমস্ত যেন সেই শিখার আগু[illegible] ধ'রে উঠে ওর মনের চারদিকে আগুন জ্বেলে দিলে। সেই আগুনে[illegible]আলোয় তার উনিশ [illegible]রের জীবন, বস্তির পারিপার্শ্বিক-অভিজ্ঞ মনে[illegible]চোখের আশেপাশে ক[illegible]ত কি লেখা কথা ফুটে উঠতে লাগল! ফেল[illegible]দেখতে পেলে না, যেন [illegible]দেখতে ভরসা হ'ল না।

ব্যাকুল হ[illegible]সে জলের গ্লাসটা মুখে [illegible]লতে গেল, গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে গলার কা[illegible] কি জড় হয়ে। [illegible]মুখে তুলতে গিয়ে পারলে না।

হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, না না না, মিথ্যে কথা। তুমি মিথ্যে কথা বলছ, ও তো বামুনদের মেয়ে—। কথাটা গলায় আটকে গেল।

হাতের জলের গ্লাসটি ভাতের থালার ওপর উপুড় ক'রে দিয়ে ভাত-মাখা হাতেই সে ঝাপসা চোখে উঠে দাঁড়াল। ঝরঝর ক'রে কয় ফোঁটা জল চোখ থেকে পড়ল, তুমি যে বলতে মা ম'রে গেছে, মা নেই!

ফেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবুরা তখনও দোকানের বাইরের ঘরে কথা কইছিলেন।

ফেলা বিমূঢ়ভাবে ভেতরের চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চৌবাচ্চার পাশে বালতির কাছে কয়েকটা চায়ের বাসন প'ড়ে ছিল। ধোয়ার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না। দুটো ধুয়ে রেখে ক্রমাগত মুখে আর মাথায় জল দিতে লাগল। ছপছপ ক'রে অঞ্জলি ভ'রে ভ'রে জল নিয়ে সে মুখে আর মাথায় দিতে লাগল। যেন পাগলের মত কি সব করতে যায়, ভুলে যেতে চায়, না কি ধুয়ে ফেলতে চায়! কি যে তার দরকার! মাথাতেই শুধু জল দেয়—ছপ ছপ ছপ[illegible]

কতক্ষণ মনে নেই।

এদিকে লাইট জ্বেলে দোকানের বাবু জিজ্ঞাসা [illegible]লেন, কি করছ অত জল নিয়ে? আমরা দরজা দিচ্ছি।

তার চমক ভাঙল। অপ্রস্তুত মুখে কি জবাব [illegible]ত গেল, বলতে পারলে না। দরজা বন্ধ ক'রে বাবুরা চ'লে গেলেন।

ফেলা ভিজে মাথায় ভিজে [illegible]পড়ে স্থিরভাবে ভাবন[illegible]ন, কল্পনাহীন, নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল সেই[illegible]নেই। যেন এক পা[illegible]ড়লে, সরলে, এখনই সমস্ত স্থিরতা, মূঢ়তা[illegible]স্তব্ধতা চঞ্চল হয়ে [illegible]ঠে বিশ্বের প্রশ্ন করবে তাকে।

কতক্ষণ গেল। শ্রান্তিতে শীতে যখন দেহ অবসন্ন হয়ে এল, কোন রকমে একটা শুকনো কাপড় টেনে নিয়ে প'রে সে তার মাদুরে শুয়ে পড়ল।

মা! মৃদুস্বরে আপন মনে বলতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় আস্তে আস্তে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তার তো কেউ ছিল না, সে তো জানত না, চিনত না কাউকে! তা হ'লে? তা হ'লে ওই তার—? আর একটি কথাও তার আলাদা ক'রে ভাববার ছিল না। একসঙ্গে নাম স্থান জাত পরিচয়—অনেক কথা মনে পড়ে। তারপর?

তার আগে? তাই? তার চোখ থেকে খুব আস্তে আস্তে জল পড়তে লাগল।

সকাল গেল কাজের মধ্যে। সেই শান্ত স্থির অভিভূত মনেই দুপুর গেল, বিকাল গেল, গভীর রাত্রিও কাটল।

তার পরদিন সকালে শশীর বর এল, কাজে যাবার সময়। যাও নি কেন? যেও [illegible] ওরা ভাত নিয়ে অনেক রাত অবধি ব'সে ছিল।

ফেলা সহ[illegible] বে বললে, সময় পাই নি। যাব 'খন।

তার শান্ত[illegible]নর তলায় অনড় অচল হয়ে মনোরমার কথা গঙ্গায় ভাসা বয়ার মত ভে[illegible] ছিল; ডুবে যায় নি, নড়ে নি, সরে নি, ওর অস্তিত্বের সঙ্গে দৃঢ় শৃঙ্খ[illegible] বাঁধা সেটা। ও আর ভাবে নি, ভাবছিল না; কিন্তু সেটা ছিলই।

রাত্রে শ[illegible] বর খেতে ডাকতে এ[illegible]। ও সহজভাবে খেতে গেল। হাতের খুচরো [illegible]সা শশীর মাকে দিয়ে এ[illegible]।

৫

কদিন গেল। ফেলা কালার মত আসে, বোবার মত ব'সে নীরবে খেয়ে চ'লে যায়।

শশীর মার অস্বস্তি বাড়ে। অনেক কথা কয়। একদিন হঠাৎ বললে, আহা, বামুন-মেয়েটি এখনও জ্বরে ভুগছে!

ফেলা কালার মতই চুপ ক'রে খেয়ে চ'লে গেল।

ঘরের মধ্যে মনোরমা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ও দিদি, আর ব'ল না, তোমার পায়ে পড়ি। আমি একটু সারলেই এখান থেকে চ'লে যাব, দিদির কাছে দিয়ে এস। নয়তো কোনখানে কাজ দেখে দিও, করব। আর আমার নাম ক'র না।

শশীর মা আশ্চর্য্য হয়ে যায়। অবাক হয়ে থেকে তারপর বলে, কেন, বললে হয়েছে কি আর? তুমিও যেমন! রোগ না দেখালে যে ম'রে যাবি! কেন বলব না? হাজার হোক মা তো!

বস্তিবাসিনীর আবেষ্টন-অভ্যস্ত অনুভূতিতে মনো 'র মনের সীমাহীন লজ্জার স্পর্শ ধরা পড়ে না।

মনোরমা শ্রান্তভাবে চুপ ক'রে যায়। আবার চোখ জ শুয়ে থাকে। জিব নড়ে কি না নড়ে, সে আস্তে আস্তে আপন মনে প্র পের মত বিড়-বিড় ক'রে নিজের কাছেই যেন বলে, না না, আমার জ্জার শেষ নেই, সীমা নেই, হে ঠাকুর, এ কি কর ন?

মনের সীমাহীন সাগরে ত ঙ্গর পর তরঙ্গ ওঠে; ন তন কাহিনীর খণ্ডচিত্র তাতে ফুটে উঠে নতুনে মিশিয়ে যায়। পুরাতন গৃহিণীর মৃত্যু, তার অসুস্থতা, বাড়ির নূতন তাকে এই বিষম অ র্তের মধ্যে এনে ফেলেছে। তার চোখ থেকে পড়তে থাকে। জের মার কথা

মনে পড়ে। তিনি কত কষ্টের মধ্যে তাদের লালন করেছেন। সে? সে কি করেছে তাঁর মতন? মা? মার মতন সে কি করেছে? অনেক জননীর চিত্র, এমন কি শশীর মার কথাও তার মনের চোখের সামনে ভাসে। তাদের সন্তানের সঙ্গে সম্বন্ধ—তার আকর্ষণ, তার মধুরতা মনে পড়ে। ও বাড়ির গৃহিণীর কথা মনে হয়, তাঁর ছেলেমেয়েদের যত্নের কথাও মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়িরই আরও অনেক কথা, নিজের কথা, দুর্ভাগ্যের লজ্জার কথা, তিক্ত লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে মনে হয়।

বিহ্বলভাবে তার মনে হয়, আর নয়, এবারে হয় মৃত্যু—নয় কোনখানে, একেবারে অজানা কোন জায়গায় পালিয়ে যাবে। মৃত্যু বোধ হয় হ'ল না, সে পালাবেই একদিন। চুপিচুপি চ'লে যাবে।

যার সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না, যে সম্বন্ধের দাবি সে কোনদিন স্বীকার করে নি, আজ তাকে—অজানা নিরপরাধ সেই বালককে এই আবর্ত্তের মধ্যে টেনে আনবার কোন তো দরকার ছিল না; সে একদিন বিনা পরিচয়ে নিঃশব্দে চ'লে যেতে পারত। যাকে কিছুই দেয় নি—মর্য্যাদা স্নেহ ‍ ‍ ‍ ‍ চয় যত্ন, তাকে এই কষ্টের মধ্যেও রাখবে না আর। মুক্তি দেবেই। ‍ ‍ ‍ ‍ ৃথিবীর এক কোণে কি আর লুকিয়ে থাকবার জায়গা মিলবে না?— ‍ ‍ ‍ ‍ নারমা ভাবে।

সুযোগ ‍ ‍ ‍ ‍ দিনকতক পরে। মনোরমা তখনও তেমনই অসুস্থ। শশীর মা, শশী, ‍ ‍ ‍ ‍ ার বর, সকলে একটা বিয়ে-বাড়ির ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে গেছে। অন্ধক‍ ‍ ‍ ‍ 'র পৃথিবী। বস্তির ‍ ‍ ‍ ‍ িরালোক জগৎকে যেন কোন্ অন্ধকারতম ‍ ‍ ‍ ‍ শের একটা অংশ মে ‍ ‍ ‍ ‍ হচ্ছে। মনোরমা ঘর থেকে বেরিয়ে এল ‍ ‍ ‍ ‍ ার মাঝে। আস্তে ‍ ‍ ‍ ‍ স্তে আঙিনা পার হয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁ ‍ ‍ ‍ ‍ ল।

গলির শে ‍ ‍ ‍ ‍ প্রান্তে একটা মাঝা ‍ ‍ ‍ ‍ ায় গ্যাসের আলো দেখা যায়

মাত্র। কল্পনার চেয়ে পৃথিবী অনেক বড়। বিমূঢ়ভাবে মনোরমা চাইলে। তার তখনও জ্বর সারে নি, শরীর দুর্ব্বলই, তার সমুখে পৃথিবী-জোড়া অন্ধকার, অপরিচয়। বিরাট পৃথিবী যেন একসঙ্গে ওর দিকে ঘোমটা দেওয়া রহস্যময় বিভীষিকার মত ইঙ্গিতময়ভাবে চেয়ে রইল। মনোরমা মূঢ়ভাবে থমকে দাঁড়িয়ে রইল, শশীর মার বস্তির ঘর তার কাছে পরম আশ্রয় মনে হতে লাগল। গলিতে ওদিকে পায়ের শব্দ হ'ল। মনোরমার পা কাঁপতে লাগল, সে চুপ ক'রে চৌকাঠ ধ'রে দাঁড়াল, তারপর ব'সে পড়ল। শশীর মার কথার চেয়ে পৃথিবীকে আরও বিভীষিকাময় মনে হ'ল।

ফেলা বাড়ি ফিরছিল। মানুষ দেখে থমকে জিজ্ঞাসা করলে, কে?

মনোরমা ভয়ে লজ্জায় অভিভূত হয়ে ব'সে রইল। জবাব দিতে পারলে না।

ফেলা আবার বললে, কে?

কম্পিতস্বরে এবারে মনোরমা বললে, আমি। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। ফেলা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াল। বুঝতে পারলে কে। তার মন অকারণ নিষ্ঠুর তিক্ত বিরক্তিতে ভ'রে উঠল। একটু থেমে নিষ্ঠুর শুষ্ক স্বরে বললে, এখানে কেন?

মনোরমা অপ্রস্তুতভাবে ঘরে ফিরে যাবার চেষ্টা করলে। উঠান পার হয়ে সে রোয়াকে উঠল, ঘরের আলোতে তার কঙ্কালসার দেহকে দেখাচ্ছিল প্রেতের ছায়া। পৃথিবীর অধিবাসিনী ব'লে মনে হয় না। মনোরমা ঘরে ঢুকল।

ফেলা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর একবার শশীর ঘরের দিকে, একবার শশীর মার ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলে। তারা কেউ নেই।

মনোরমা চুপ ক'রে চৌ[illegible]য়ে ছিল। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা

ফোঁটা ক'রে জল পড়ছিল। উচ্ছ্বসিত কান্না নয়, অভিমানের ক্ষোভের আপনার প্রতি কারুণ্যের অশ্রু নয়।

ফেলা দোকানে ফিরে গেল। দোকানে তখনও লোক আছে। গল্প চলছে।

সে চায়ের বাটি, শরবতের গ্লাস ধুয়ে রাখলে। তারপর চুপ ক'রে দাঁড়াল বারান্দায়, অন্য আদেশের অপেক্ষায়। কিন্তু বাড়ির তারা গেল কোথায়? মনোরমাই বা কোথায় যাচ্ছিল? হঠাৎ ফেলার বিষম ভয় হ'ল, শশীর মা তাকে তার ঘাড়ে ফেলে চ'লে যাবে না তো? যায় যদি? তারপরেই মনে হ'ল, শশীদিদি তার বরসুদ্ধ যাবে কোথায়? আর যায়ই যদি, সেও পালাবে ফেলে। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ডাক এল, ফেলা, চারটে কমলালেবু নিয়ে এস তো। শোনা গেল আদেশকর্ত্তা কাকে বলছেন, হ্যাঁ, মার জ্বর কদিন। তারপর আবার ফেলাকে বললেন, এই নাও পয়সা। পয়সা দিলেন ফেলাকে।

ফেলা পয়সা নিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

লেবু কি[illegible] ফেরবার মুখে কি মনে হ'ল, সে ফিরল। ফিরে আরও দুটো লেবু কি[illegible] নিলে।

৬

রাত্রি অ[illegible] হয়েছে। ফেলা লে[illegible] দুটো নিয়ে বাড়ির দিকে গেল। এতক্ষণে হয়[illegible] শশীরা ফিরেছে, লেবু দুটো মাসীকে দিলেই হবে, সে দেবে 'খন ও[illegible]

আঙিনা [illegible]ন তেমনই অন্ধক[illegible] [illegible]দর ঘরের দিকেও আলো

নেই। শশীর ঘর এখনও তালাবন্ধ। দরজার কাছে গিয়ে ফেলা দাঁড়াল। ঘরের কোণে কেরোসিনের ডিবেটা অনেকক্ষণ ধ'রে জ্ব'লে অনেকখানি কালো ভুসোয় মোটা হয়ে সামান্য একটুখানি আগুনের মত হয়েছে। শিখাটা নিবে গেছে মনে হচ্ছে। তবু কেমন ক'রে যেন ঘরে একটুখানি আলো রয়েছে। ফেলা উঁকি মারলে। কঙ্কাল তেমনই শুয়ে আছে, মনে হ'ল, ঘুমোচ্ছে। এগিয়ে এসে সে আলোটা আস্তে আস্তে উস্কে দিলে। সেটা যেন মিটমিট ক'রে ওর দিকে চেয়ে দেখলে। ঘরখানা আশ্চর্য্য নিস্তব্ধ।

ফেলা একটু চুপ ক'রে দাঁড়াল। বড্ড ঘুমোচ্ছে, বুকের ওপর একটি হাত, আর একটি হাত পাশে আধকাত হয়ে প'ড়ে। ও চুপ ক'রে দেখলে আজ, হ্যাঁ, খুব বিশ্রী, মৃতের মত দেখাচ্ছে।

সামান্য অল্প একটু দয়ার মত ভাব তার মনে জাগল। লেবুটা দেবে? না, ঘুম থেকে উঠে আপনি খাবে।

আনন্দ দেবার আত্মপ্রসাদের ইচ্ছা মনের কোণ থেকে উঁকি মারে, জাগিয়েই দিক না, খায় তো এখনি খাবে 'খন।

ফেলা এগিয়ে আসে। মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে [illegible]

দেখতে যেন ভাল লাগছে না। কিন্তু কি ক'রে এ[illegible]বে? শোন, এই লেবু—কমলালেবু খাবে একটা? একটু থেমে আ[illegible]ও নীচু হয়ে, একটু জোরে বললে, ওঠ, একটা খেলে ভাল লাগ[illegible]। না, বড্ড ঘুমচ্ছে, পরেই খাবে।

সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। [illegible]র নিস্তব্ধ। ঘটি, বাটি, বাসন, চৌকি, প্রদীপ, পিলসুজ, বাক্স, পেটরা অ[illegible]ছা অন্ধকারে যেন কি[illegible]ম দেখাচ্ছে।

ফেলা ফিরে এল। কি ম[illegible] ক'রে কেরোসিনের ডি[illegible]টা হাতে নিয়ে মনোরমার মাথার কাছে নীচু [illegible]। কি বিশ্রী গভীর ঘু[illegible] এত গভীর!

আরও একটু নীচু হ'ল, আলোটা মাথার কাছে রেখে হাতটা মাথায় রাখবার জন্তে এগিয়ে এনে মাথায় না রেখে নাকের কাছে নিয়ে গেল। নিশ্বাস কই ?

এবারে ফেলা কপালে হাত রাখলে। কপাল হিম, স্যাঁতসেঁতে ঘরের মত কঠিন, ঠাণ্ডা, চটচটে একটু।

কতটুকু সময়, হয়তো মিনিটখানেক পরে ফেলা উঠে দাঁড়াল। মনের ভেতর আর সমস্ত কথা কেমন মিলিয়ে গিয়ে শুধু নির্লিপ্তভাবে জাগছিল, হ্যাঁ, মারা গেছে, মৃত্যু হয়েছে। চুপ ক'রে একটুখানি কঙ্কালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ কি মনে ক'রে ফেলা চোখ ফিরিয়ে নিলে। তার মনে হ'ল, এই খানিকক্ষণ আগেই—হয়তো যে সময়ে তার মৃত্যু হয়েছে, ঠিক সেই সময়েই সে ভাবছিল, যদি শশীর মা তাকে ফেলে কোথাও চ'লে যায়! মনে হচ্ছে, সেই সময়েই মারা গেছে। ফেলা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাথার কাছে কমলালেবু দুটো নিয়ে প্রদীপটা মনোরমার শবদেহ আগলে চেয়ে জেগে রইল।

মণিকর্ণিকা

হায় হায়, এ জান না? ব্রাহ্মণের মেয়ে—হিন্দুর মেয়ে! লোকে বলবে কি! এমন জানলে বুঝি আমি বিয়ে করতুম!—নৌকো বেশ স্রোতে চলেছে, স্বামী কপট গাম্ভীর্য্যে বললেন।

দশাশ্বমেধ ঘাট-ভরা স্নানার্থী স্নানার্থিনী। ঘাট থেকে মাঝে মাঝে একটা একটা নৌকো ক'রে যাত্রীরা দেবদর্শনযাত্রায় বেরুচ্ছে।

স্ত্রী বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, না হয় ব্রাহ্মণ্যের একটু শিক্ষা স্বামীর কাছেই পেলাম। তোমার পুণ্যি ক্ষয় হয়ে যাবে না। জান, শাস্ত্রে বলে 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ'। আমি জানলে তোমারই ভাগ ভারী হতে পারবে।

এদিকে তো দেখছি শাস্ত্রের জ্ঞানও আছে!

আহা, বলই না, কেবল জ্বালাতন করবে!

আচ্ছা, শোন। সুপুরি-টুপুরি নেই?

কেন কি হবে? খাবে? আনি নি তো। এ [illegible] মাঝ-গঙ্গায়—আগে মনে করতে হয়।

হায় হায়, হাতে ক'রে কথা শুনতে হয় যে!

যাও! বলতে হবে না।—এবারে স্ত্রী রেগে গেল।

আহা, শোন শোন, এবারে সত্যি বলছি, শোন। ভাল ক'রে পা ঢাকা দিয়ে তবে বস, খানিক[illegible]ণের জন্যে অন্তত গুরুজন ব'লে মনে কর।

স্ত্রী মুখটা গম্ভীর ক'রে ব'[illegible] রইল।

পুরাকালে একদা এক[illegible]ীষ্মকালের সিতষা[illegible]তে দেবাদিদেব

মহাদেব ভগবতী পার্ব্বতীর সঙ্গে এই বারাণসীধামে ভাগীরথীতীরে সলিল-সিক্ত স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করছিলেন। এই যেমন আমরা আজ সকালে—

আহা, কি বুদ্ধি! ঠাকুর-দেবতার কথার সঙ্গে নিজেদের কথা কইলে অপরাধ হয় না?

হয় বুঝি? ও, আচ্ছা, শুধু বলছি, শোন।

অতঃপর রাত্রির গভীরতার সঙ্গে স্নিগ্ধতা লাভ না ক'রে গ্রীষ্ম উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হতে লাগল। বারাণসীর গরম দেখছ তো; সেবার আদি-দম্পতি কৈলাসের শৈলাবাসে যান নি।

আবার! এমন যদি কর তুমি, চাই না শুনতে; আর যেন কালী সিঙ্গির মহাভারত পড়ছেন!—স্ত্রী রাগ ক'রে মাঝির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

তুমি কালীসিঙ্গির মহাভারত পড়েছ? শুধু এইটেই পড় নি? আচ্ছা আচ্ছা, রাগ ক'র না, ভাল ক'রে বলছি। কিন্তু ও হতভাগা কি তোমার মর্ম্ম বুঝবে, এই দিকেই অনুগ্রহ-নেত্র পাত কর।

তারপর—এদিকে স্বামীর সঙ্গে সপত্নীকে নৈশ-সমীরণ সেবন করতে দেখে গঙ্গা গরম হয়ে উঠেছিলেন; বুঝতে পার আশা করি, অবশ্য তোমার সপত্নী নেই।

স্ত্রী সকোপে গঙ্গার স্রোতের দিকেই চেয়ে ছিল; কথা কইলে না।

সুতরাং, সমীরণ যে স্নিগ্ধ না হয়ে উত্তরোত্তর 'লু'বৎ হয়ে উঠছিলেন, বলাই বাহুল্য। তখন ভূতভাবন ভগবান ধূর্জ্জটি মহাদেবীকে বললেন, দেবি, বহুক্ষণ বিচরণ-ক্লেশে তোমার যথেষ্ট শ্রান্তি হয়েছে এবং গ্রীষ্মটাও কিছু উৎকট প্রকারের; অতএব যদি অনভিপ্রেত মনে না কর, তা হ'লে আমরা স্বচ্ছশীতলা ভাগীরথী-সলিলে কিয়ৎকাল অবগাহন ক'রে শ্রান্তি অপনোদন করি

দেবী তোমার মতন ভ্রূভঙ্গি ক'রে বললেন, না, ঘাটে তোমার প্রেতরা রয়েছে, আমি তাদের সামনে অবগাহন করব না। আসলে ভগবতী গঙ্গা কিনা দেবীর সপত্নী, তাই স্বামীকে তাঁর স্পর্শ লাভ করতে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

টীকাটি কি কথক-ঠাকুরের স্বরচিত ?—স্ত্রী একটু হাসলে।

বাঃ, বেশ তো কথা কইতে জান ! নাঃ, টীকা আমার কেন ? কেন, তোমাদের মনের কথা কে না জানে ? এই সেদিন ওদের চায়ের আর পানের সুখ্যাতি করলুম, অমনই তুমি আর সেখানে গেলেই না।

সে কি আমার সতীন ?—স্ত্রী হাসলে। কি কথার ব্যবস্থা ? আমাকে তো আর ভূতে পায় নি যে, যাকে তাকে হিংসে করতে যাব ! আর সে তো কত বড় আমার চেয়ে ! বল, তারপর ? এমন বাজে বকতেও পার !

স্বামী ঈষৎ হেসে বললেন, ওঃ, তোমার বয়সী হ'লে বুঝি করতে ?

স্ত্রী উত্তর দিলে না।

শোন, ভূতনাথ শঙ্কর তখন ভাবতে লাগলেন। [illegible] কল্পনা স্থির হয়ে গেল। যোগবলে একটা ছোট্ট জলাশয় সৃষ্টি ক'রে ফেললেন গঙ্গার ধারে। তারপর তো তাঁরা দুজনে স্নান-টান ক'রে নিলেন। রাত্রি প্রায় তখন শেষ হয়ে এসেছে। পার্ব্বতী ঘাটে উঠে মাথা মুছতে গিয়ে হঠাৎ বললেন, আমার কর্ণিকা ? সেই যে মণি দেওয়া দুটোই তো পরেছিলাম, যা দিয়েছিলেন সেবা[illegible]।

কর্ণিকা কি ?—স্ত্রী বললে।

ইয়ারিং গো, কানের তোমা[illegible]।

ভোলানাথ বললেন, কর্ণি[illegible] পুষ্পেরটা ?

দেবী বললেন, আঃ, বড় ভুলে যাও, সেই যে মণি দেওয়া জোড়া! ভোলানাথ ভুলেই গিয়েছিলেন, আর জলে নামতেও ইচ্ছে ছিল না। আমরা হ'লে হয়তো বলতুম, আবার কিনে নিও। কিন্তু সে সময় বোধ হয় কাশীর ট্রেজারি অন্নপূর্ণার হাতে।

যাই হোক, দেবী সিক্তবস্ত্রে চক্রতীর্থের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন।

আহা, এদিকে বলা হচ্ছে, গরম 'লু' চলছে!—স্ত্রী ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললে।

আঃ, শীতে কেন গো, রাগে; শীতেই শুধু বুঝি কাঁপুনি ধরে? না হয় একটু অলঙ্কার দিলাম। যাই হোক, তিনি শুধুই দাঁড়িয়ে রইলেন না নয়, কর্ণিকা না পেলে কাপড় বদলাবেন না। ভগবান ভোলানাথ কি করেন! ফের জলে নাবলেন, কিন্তু অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না। তখন নন্দীকে ডেকে এই সমূহ বিপদের কথা জানালেন। নন্দী জানত মার ধাত। সে বুঝিয়ে মাকে কাপড় বদলাতে পাঠিয়ে দিলে; আর ইত্যবসরে—ভূতভাবনের সব কটা ভূতকে দিলে সেই চক্রতীর্থে নামিয়ে। তারা মার প্রসাদ-আকাঙ্ক্ষায় না পারে এমন কাজই নেই। খানিকক্ষণ পরেই কর্ণিকাটি পাওয়া গেল।

বুঝতেই পারছ, তখন দেবীর সন্তোষ হ'ল এবং দেবাদিদেবের প্রাণ বাঁচল। দেবাদিদেব বুদ্ধিমান দেবতা, ভোলানাথ হতে পারেন। সেই অবধি ঘটনাটি অনেক অভাজনের দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকতে পারবে বিবেচনা ক'রে, চক্রতীর্থ একটি বড় তীর্থ, আর ঘাটটির নাম মণিকর্ণিকা —পুরুষজাতির মধ্যে এই প্রচার করিয়ে দিলেন।

হুঁ, সবই কি অনাছিষ্টি! এত ব[illegible] কইতে পার!

আহা, বি[illegible] খরচে কথা শোন[illegible]ন তো? না হয় একটু গয়না

পরিয়েছি, ঘাটের কথকরাও তো বলে, সেখানে শুনলেও যে একটি পয়সা দিতে হ'ত! আমি বেচারা শুধুই ব'কে মরলাম।

আঁচল থেকে একটি পয়সা নিয়ে স্ত্রী গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলে। মাঝি তখন একমনে দাঁড়ের দিকে চেয়ে ছিল।

স্বামী মৃদু হেসে 'এই ভক্তি তোমার অচলা থাক' ব'লে পয়সাটি কুড়িয়ে পকেটে রাখলেন।

মন্দিরের পর মন্দির, ঘাটের পর ঘাট ক্রমে অতিক্রম ক'রে নৌকো অগ্রসর হতে লাগল।

এটি হ'ল মাতৃঋণ-শোধ ঘাট। একজন ছেলে এই মন্দিরসুদ্ধ ঘাট বাঁধিয়েছিল; উৎসবাদির পরই এটি হেলে পড়ল নাকি, লোকে বলে।

খরস্রোতা ভাগীরথী; ওপারে রামনগর, সবুজ ক্ষেত, দূরে ঘন বন। স্বামীর মাঝে মাঝে টীকা শুনতে শুনতে মণিকর্ণিকার ঘাটে নৌকো এসে ঠেকল।

দূরে—দত্তাত্রেয়ের চরণ-পাদুকা মন্দির; সম্মুখে চক্রতীর্থ; চারদিকেই জনতা, পাণ্ডা, শিষ্য, মন্ত্রপাঠ, মন্দির, সিঁড়ি।

ওই দিকে শ্মশান।—স্বামী বললেন। চল এবার বাড়ি।

একটু শ্মশানটায় চল না! চিতায় জল দিতে হয়, ঠাকুমা বলেছিলেন। এখানে নাকি সধবা ছাড়া আসে না। দেখে আসি।

অনিচ্ছুকভাবে স্বামী সেদিকে অগ্রসর হলেন।

সবে একটি মেয়েকে এনে রেখেছে। রাঙাপাড় শাড়ি, টকটকে লাল সিঁদুর কপালে ঢালা, পা দুখানি আলতা-রাঙা। সঙ্গে অনেক লোকজন।

স্বামী চোখ ফিরিয়ে নিলেন। স্ত্রী মুগ্ধ হয়ে, অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

কখন কি আরম্ভ হ'ল কে জানে। একটি যুবক, সম্ভবত মেয়েটির স্বামীই হবে, হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ব'সে ছিল; তাকে আহ্বান করলে একজন। তার মুখ দেখে স্বামী শিউরে উঠলেন। তার ওপরেই বোধ হয় অপ্রীতিকর কর্ত্তব্যের ভার—

স্ত্রীও 'মাগো' ব'লে মুখ ফিরিয়ে নিলে, স্বামী তার হাতটা ছুঁয়ে ডেকে বললেন, চল, আর নয়।

নৌকোয় ব'সে আর কোন কথাই মনে হ'ল না কারুর। দুজনেরই দুদিক দিয়ে একই ঘটনা মনে ছবি আঁকতে লাগল—ভয়ে, বেদনায়, আশায়, দুঃখে, বিভীষিকায়।

সাত আট বছর গেছে।

বাপ-মায়ের শরীর খারাপ; তাঁরা কাশীবাস করবেন। ছেলে তাই তাঁদের নিয়ে এসেছেন। একটি বাড়ি কিছুদিনের জন্য নেওয়া হয়েছে। ছেলে ছুটি নিয়ে এসেছেন।

ওগো, যাবে আজ? একটি দিন যদি বেরুলে আমাদের সঙ্গে?—স্ত্রী এসে অনুযোগ করলে।

স্বামী টেবিলের কাছে ব'সে অনেক কাগজপত্র—স্ত্রীর মতে বাজে কাজ—নিয়ে কাজ করছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন, তুমি তারকের সঙ্গে যাবার ঠিক কর, লক্ষ্মীটি। এইগুলো অফিসে আজই পাঠাতে হবে।

মণিকর্ণিকায়ও তোমার যেতে ইচ্ছে নেই? ও-ও কি দেখেছ?

স্বামী চকিত হয়ে মুখ তুললেন। একবার বললেন, অ্যাঁ? তারপর 'না' ব'লে মুখ নীচু করলেন।

তুমি যাও ওদের সঙ্গে আজ, আমি তোমাদের সারনাথে নিয়ে যাব 'খন।

তা হ'লে চারু রইল, দেখো, যেন একলা না রাস্তায় যায়।—স্ত্রী বেরিয়ে গেল।

বাবা, ও বাবা, দেখ এটা কি?—খানিক পরেই চারু ছুটে এল, হাতে একটি সুন্দর ছোট কেস। দেখ না কেমন সুন্দর?

বাপ সস্নেহে মুখ তুললেন, কি রে?

জিনিসটি দেখেই মুখ ম্লান হয়ে গেল, একটি সুন্দর কেসে ততোধিক সুন্দর মুক্তোর ইয়ারিং; পিতা কম্পিত অন্তরে সেটা খুলছিলেন।

কোথায় পেলে মা?

ঐ ঠাকুমার বাক্সে ছিল; টাকা বের করছিলেন, আমি নিয়ে নিলাম। কি বাবা? কোথায় পরে?

ওটা? ওটা কর্ণিকা, মণিকর্ণিকা। কানে পরতে হয়।

কার বাবা?

ও তোমার মার।—ব্যাকুল পিতা কাতর হয়ে উঠলেন।

আমি পরব?

পর।

বাপ চুপ ক'রে কাগজের দিকে চেয়ে রইলেন, কথা কওয়া যেন অসম্ভব মনে হচ্ছিল।

তুমি পরিয়ে দাও না!

বাপ আস্তে আস্তে মেয়ের কানে সেটা পরিয়ে দিলেন। কন্যা নতুন গহনা প'রে আনন্দে নৃত্য করতে করতে দাসীকে দেখাতে চ'লে গেল। বাপের মনে পড়ল—সেই প্রথ[illegible]ত্রী, মণিকর্ণিকা দর্শন।

কলকাতায় ফিরে [illegible] পছন্দ ক'রে, একটি ইয়ারিং কেনা,

তার নামকরণ, তারপর—তারপর তার সাধ মিটে যাওয়া—সেই মণি-কর্ণিকার মেয়েটির মতন।

রাত্রি নটা।

স্বামী ওপরে এসে কাপড় পরছেন; কোথায় নিমন্ত্রণ, বন্ধুদের সঙ্গে সব একত্রে যেতে হবে।

খাটে চারুর মা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। চারু ঘুমোচ্ছে।

হ্যাগা, চারুর কানে আজ একটা কি দেখলাম, কিনেছ? কি কর্ণিকা নাকি! ও বললে মার, আমার তো নয়!

খোকা ঘুমিয়েছিল; স্ত্রী তাকে শোয়াতে শোয়াতে মৃদু ভাষণে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে।

কি চারুর কানে? কই, না, কিনি নি তো কিছু। মনটা ব্যস্ত, মনে পড়ছে না; স্বামী পাঞ্জাবিটার বোতাম আছে কি না দেখছিলেন।

চমৎকার জিনিসটি! ও বললে, মার; তাই ভাবলুম, বুঝি কিনেছ বা। দেখ না, এই যে।—আস্তে আস্তে মেয়ের কান থেকে খুলে নিয়ে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল।

স্বামীর আর বুঝতে বাকি ছিল না। তিনি নীচু হয়ে পাঞ্জাবিতে লাগাবার জন্যে সোনার বোতাম কটা তুলে নিলেন। স্ত্রী এসে সেটা তাঁর হাতে দিয়ে বোতাম কটা লাগাতে লাগাতে বললে, কি সুন্দর, না? কবে কিনলে?

ওটা এখন তো কিনি নি, ওটা তার ছিল।—স্বামী সেটি টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

স্ত্রী একবারে চুপ হয়ে গেল। [illegible] সপত্নীর ওপর ঈর্ষা ছিল না এতটুকু; নিজের তুলনায় সে যে [illegible] আদরিণী ছিল, তাও

সে জানত, বুঝতে পারত; আজও তার ওপর স্বামীর গভীর চিরস্তব্ধ গোপন প্রেমের কথাও জানত সে। সেজন্য স্বামীর ওপর বেশি শ্রদ্ধাই ছিল, যা ওকে ভালবাসা দেখালে হয়তো হ'ত না; কিন্তু অভিমান নারীর—তাও তো ছিল। স্বামীর অর্দ্ধভাগিনী সে যে নয়, সে তা জানত। পা যেন সেইখানেই থেমে গেল। বেদনায় সে মাথা নীচু ক'রে টেবিলের ওপরের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগল। যে কথার কোনও উত্তর নেই, সে কথা একেবারে কোন্‌খানকার সম্ভ্রম বেদনা দুঃখের বার্ত্তা বয়ে হঠাৎ দাঁড়াল এসে। তাকে এড়িয়েও যাওয়া যায় না; এমন সম্পর্ক নয় যে, কিছু কথাও বলা যায়।

একটু থেমে নীচু মুখেই সে আস্তে আস্তে বললে, ফিরতে তোমার রাত হবে?

স্বামী তার দুঃখ জানতেন। একটু বিব্রতভাবে তার মাথার ওপর একবার মুখটা রেখে বললেন, হ্যাঁ, আমার তো আজ দেরি হবে, ওদের যে বিয়ে; তুমি শুয়ে প'ড়।

টেবিলের ওপরে মণিকর্ণিকাটিতে আলো প'ড়ে ঝিকমিক করছিল, স্ত্রী চুপ ক'রে চেয়ারখানি ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। স্বামী নীচে গেলেন।

বিশুদ্ধ প্রেম

বাংলা দেশে সে সময়ে বিংশ শতাব্দী তার নব যৌবনের ('২৯।'৩০ সালের) প্রেমের স্বপ্নে যেন প্রহ্লাদের সর্ব্বত্র—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হরি-দর্শনের মত প্রেমকে দেখছিল।

সেদিনের সাহিত্যে—মতে, তত্ত্বে, পাণ্ডিত্যে নানা -'লজি' নাম দিয়ে নানা জাতির প্রেমের ব্যবচ্ছেদাগার আর মিউজিয়ম গ'ড়ে উঠছিল।

এই শতাব্দীর কোলে যারা জন্মলাভ করেছিল, তারাও তার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে নি। তার যৌবনের মোহ, তারুণ্যের স্বপ্ন এদের কথা, কাব্য, সাহিত্য, সিনেমা, মাস, ঋতু, বৎসরকে অভিভূত ক'রে রেখেছিল।

এই আদি ও কৃত্রিম, আদিম ও অপূর্ব্ব, সহজ ও কঠিন বিষয়ের আলোচনায় সে যখন বাংলা সাহিত্যে চতুরঙ্গ (কাব্যে, প্রবন্ধে, গল্পে, অনুবাদে) বাহনে যাত্রা করেছে, হিতেনকে তার ছোঁয়াচ দিয়ে গেল।

মাথা নীচু ক'রে হিতেন লেখবার জন্যে ভাবতে বসল—প্রেমের কথা। যাকে প্রতীচ্যের পণ্ডিতেরা কেউ কেউ উনিশ শতাব্দীতেই—তার প্রবীণ বয়সেই ছিঁড়ে কেটে নেড়ে-চেড়ে বইয়ে বিশ্লেষণ করছিলেন, সমাজে আশ্লেষণ ক'রে দেখবার কথা ভাবছিলেন, হিতেনের সামনে সেই সব তত্ত্বের শেষ নেই, তথ্যের অন্ত নেই। প'ড়ে শেষ করা যায় না।

এ নিয়ে প্রবন্ধ লেখা শক্ত, তত্ত্ব আরও শক্ত, তথ্যও সব জানাই শক্ত; তবে? তবে কি? গল্প? তা লেখা যায়; কিন্তু হিতেন শুধু ভাবে। প্রাচ্য প্রেম, প্রতীচ্য প্রেম, আমেরিকার স্বাধীন প্রেম, পুরাতন

ভারতবর্ষীয় বন্দী প্রেম, নব্য রাশিয়ান মুক্ত প্রেম, প্রাকৃতিক প্রেম, 'বিষ' লেখা লাল লেবেল মারা অর্থাৎ বাধাহীন প্রেম, বিশুদ্ধ ও আদর্শ প্রেম, কত রকম যে মনে আসে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, এবং সব দেশের লোকেই বলেন, আমারটাই আদি ও অকৃত্রিম।

হিতেন লেখে। বিশুদ্ধ প্রেম নাম দেবে, না, প্রেমের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন নাম দেবে?

যাই হোক, সে লেখে—

ভারতীয় প্রেম স্ত্রীর পক্ষে ও পুরুষের পক্ষে—

স্ত্রীর পক্ষে		পুরুষের পক্ষে	
চিনি (মধুর রস)	এক-চতুর্থাংশ	বীর	অর্দ্ধেক
সখ্য	এক-দ্বাদশাংশ	মধুর (মাদক)	এক-চতুর্থাংশ
দাস্য	অর্দ্ধেক	সখ্য	এক-দ্বাদশাংশ
করুণ ও অন্যান্য	বাকি অংশ	অন্যান্য	বাকিটা
বীর	নাস্তি	করুণ	নিষ্প্রয়োজন

অর্থাৎ যেন একটি মিক্‌শ্চার বা আরক—সুগার এত, ষ্টিমুল্যাণ্ট এত, সত্যি ওষুধ এত।

প্রতীচ্য প্রেমের ঐরকম কিছু এদিক-ওদিক; সোভিয়েট প্রেম আরও কিছু অদল-বদল, প্রায় সমান সমান। তাতে সখ্য ও মধুর ভাব এবং দায় ও দায়িত্ব সমান প্রায়। বীর ও দাস্য গুপ্তভাবে। নানা সমাজের নানা দেশের প্রেম; পুরুষের জন্যে এক রকম, মেয়ের জন্যে এক রকম। সমাজ-প্রত্যন্তবাসী 'নট টু বি টেক্‌ন' লেখা অবিশুদ্ধ নিন্দিত প্রেম। কিঞ্চিৎ শিক্ষা, কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা, কথঞ্চিৎ অধিকার দেওয়া, নব্য ভারতীয় স্ত্রীর পক্ষে প্রযোজ্য প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন—তার তলায় লেখা 'শেক দি বট্‌ল'; অর্থাৎ বেশ ক'রে নেড়ে-চেড়ে সমাজে পরিবেশিতব্য। নইলে মেয়েদের

নিয়ে—কি বলা যায় কি হবে, হয়তো ভীষণ কিছু, বলা যায় না কি ভীষণ—।

হিতেনের হঠাৎ নাম বেরিয়ে গেল।

এত বেশি পত্রিকা যে সকলে প'ড়ে উঠতে পারে না, নিতান্ত বোকা মেয়েরা ছাড়া। কিন্তু তবু হিতেনের নাম হ'ল কিছু।

কিন্তু কে জানত—তারপরও এর ফল!

বাবা ছিলেন না বেঁচে। হিতেন করছিল লেখাপড়া। আকস্মিক প্রেমের প্রবন্ধের এই খ্যাতিতে মা অভিভূত হয়ে গেলেন। সেকেলে বিভীষিকাবশে মা প্রেমের নাম শুনতেই বসন্ত-এপিডেমিকে টিকে দেওয়ার মত প্রতিকার চিন্তা করলেন।

হিতেনের সম্বন্ধ হতে লাগল।

চেনা-পরিচয়ের ক্ষেত্রে, হিতেন যাতায়াত করে, এমন একটি বাড়িতে হ'ল সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষীয় প্রেমের সবই শাস্তম্। মা বাপ পরিজন সকলে মিলে সম্বন্ধ করবেন, ছেলেকে বলবেন, আমরা মধ্যস্থ আছি।

ছেলে যথাসময়ে টোপর-চেলি প'রে বিবাহ ক'রে সুখে (দুঃখে) স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করবেন। মেয়ের কথা বলবার এ জায়গা নয়, সে তো কেউই নয়, তাকে তো রাবণে মারলেও মারবে, রামে মারলেও মারবে, বিয়ে তার হবেই। তার কাজ—সে শুধু মুখ বুজে থাকবে এখন, চোখ বুজে থাকবে আগে ও ভবিষ্যতে।

কিন্তু লেখাপড়া দেখে মুগ্ধ হবার দিন যে কন্যাপক্ষের গেছে, (অন্তত অনেকের) তা মার জানা ছিল না। এম. এ. বা এম. এস-সি. পড়া ছেলের মোহ সকল মেয়ের বাপকে মুগ্ধ করে না, বিশেষ ক'রে যে ছেলে তার সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা করে। তার তো ভবিষ্যৎ নেই বললেই হয়।

সাহিত্যিক হবার সুযোগ—যেমন একটু লোকে নাম চেনে, তেমনই দুর্য্যোগও কম নেই। লোকে বঙ্কিমবাবু, রবিবাবু, শরৎবাবু না হ'লে নামের দাম দেয় না। সুতরাং বিয়ের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের চেয়ে বাঁধা মাইনের কেরানীর দর আছে।

মীনার বাবার বৈকালিক জলযোগের সময় মীনার মা বললেন, আজ হিতেনের মা এসেছিলেন বেড়াতে।

জলযোগ করতে করতে স্বামী বললেন, হুঁ।—জাম কিম্বা লিচুর আঁটি ছিল মুখে।

হিতেনের সঙ্গে মিনুর বিয়ের কথার আঁচ দিলেন।—বিনা ভূমিকায় মীনার মা বললেন।

মেয়ের বাপ বললেন, বটে! তাঁর লক্ষণে কন্যাদায়গ্রস্তের উল্লাসের ভাবের কিছু অভিব্যক্তি দেখা গেল না।

মীনার মা পুনশ্চ বললেন, ছেলেটি এম. এ. পাস, ওদের কলকাতায় দুখানা বাড়ি আছে, ভাই বোন মাত্র দুটি, বেশি ন্যানজারি নেই সংসারে।

কি করে ছেলেটি? এখানে আসে না মাঝে মাঝে মণির কাছে?—বাপ থেমে থেমে জিজ্ঞাসা করলেন।

মা বললেন, হ্যাঁ, আসে তো। মা উৎসাহিত হয়েছিলেন। করে না এখন কিছুই, তবে শুনছি কাজের চেষ্টা নাকি করছে। বেশ লেখে, পড়েছ?

মীনার বাবার সরকারী কাজ। তাঁর মনে সাহিত্যের রসগ্রহণের অবসর বা আবশ্যক ছিল না।

লেখে? কি লেখে?—বাপ আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলেন।

এই গল্পটল্প কি সব লেখে, মণি-মিনুরা জানে, পড়েছে।

বাপ সংক্ষেপে বললেন, কি দেখে মেয়ে দেবে ? লেখা ?

সেকেলে ধরনের মীনার মা চুপ ক'রে রইলেন। কথাটির সুরের তাৎপর্য্য ধরতে পারলেন না। হিতেন-বর্ণিত ভারতবর্ষীয় প্রেমের প্রেসক্রিপ্‌শনের একটি ছুটি ভাব তাঁর বেশিই ছিল। এবারে মীনার বাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, গেলাসে হাত ধুয়ে পাশে তেপায়ায় রাখা তোয়ালেতে মুখ মুছে মসলা এবং সিগারেট মুখে নিয়ে বললেন, লোকে মেয়ের বিয়ে দেয় ছেলের দিকের অবস্থা দেখে। লিখে যদি রবি ঠাকুর হ'ত, দিতাম। মেয়ের এখন আর সে দিন নেই। আমার মেয়ে, ইম্পিরিয়াল সার্ভিসওয়ালা ছেলে না হ'লে দেব না।

ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের মানে মা জানেন না। তাঁর স্বামী সেকেলে বি. এ. পাস, দার্জ্জিলিং কলকাতার মোটা বেতনের চাকুরে। তাঁর কাজ ইম্পিরিয়াল, প্রভিন্সিয়াল কিংবা অন্য কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত, তিনি জানেন না।

হিতেনের মা এদিকে আশান্বিত হয়ে শ্রী বরণডালার ফরমাস দিয়েছেন বললেই হয়।

হিতেনও, না জেনেই, মীনার দাদার, মীনাদের বুদ্ধির ও থাকার জৌলুসে মুগ্ধ হয়েছিল। সেটা অবশ্য প্রেম নয়; এবং মীনাও তার সাহিত্যিকতা ও তৎজনিত খ্যাতিতে শ্রদ্ধাবিষ্ট হয়েছিল, সেটাও মোহ নয়।

হঠাৎ পরম্পরায় ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের আস্ফালন কানে গেল দুই তরুণ পক্ষের।

হিতেন প্রথমটি হ'ল কিছু অভিভূত, তারপরে হ'ল বিদ্বিষ্ট, তার পরের পর্য্যায়ে আসে দার্শনিকতা—হিতেন দার্শনিক হ'ল।

মীনা ভারতবর্ষীয় লক্ষ্মী মেয়ে। ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের ও অন্যান্য নিতান্ত পাস করা বুদ্ধিমান ছেলের ভবিষ্যৎ ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে দাদার

আলোচনা স্মিতমুখে শুনলে। উপসংহারে দাদা সাহিত্যিকদের কথাও কিছু বললে।

হিতেনের মা ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট মনে হিতেনের জন্যে জোর চেষ্টায় মেয়ে দেখতে লাগলেন। হিতেনকে নির্লিপ্তভাবে প্রেমের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনে নোট ক'রে নিতে হ'ল আরও কটি জিনিস।

ইম্পিরিয়াল সার্ভিস—ভাল মেয়ের পক্ষে একটা প্রধানতম প্রেমের অংশ। অর্থাৎ—

ভারতবর্ষীয় হিন্দু প্রেম, তথা বিবাহ।
চাকুরি—এত মাহিনার—
তাতে মধুর রস (প্রেম) এত কম বেশি
ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এক বিষয়ে বার বার মেয়েদের অধিকারের মত প্রবন্ধ লেখা উচিত, না ভাল ? এবার আর হিতেন কিছু লিখলে না।

হিতেন চাকরির চেষ্টা করতে লাগল।

অপমানিত হিতেনের মার কাছে কন্যাদায়গ্রস্ত বেকারের সীমা-সংখ্যা হয় না। নিকামায়ে দেশে বিয়ে একমাত্র কাজ, তাও হবে না, সহ্য করা শক্ত। হিতেনের মা মেয়ে দেখেন।

হিতেনের দিদি এসেছিলেন, খাবার সময় বললেন, শুনেছ মা, ওরা এঁকে বড় ধরেছে (কোন মেয়ের বাপ)। মেয়েটি ভাল, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ছে, বেশ নাচতে পারে কিন্তু। রঙও খুব ফরসা।

মা রান্নাঘর থেকে কি একটা কথা বললেন। মার কথার জবাবে দিদি বললেন, হ্যাঁ, মুখ চোখ একটু কেমন, তাতে কি ; দেবে-থোবে বেশ।

পিসতুতো এক ভাজ এসেছিলেন উমেদারি করতে, তাঁরই খুড়তুতো বোন, বললেন, বাবার বড় ইচ্ছে, এখানে হয়।

পিসতুতো ভাই খাচ্ছিলেন হিতেনের সঙ্গে। বললেন, বুঝতে পারছ না মামী, শেষে কোন্ লেখাপড়া জানা কাদের মেয়ে বিয়ে ক'রে বসবে! ভাইয়ের দিকে চেয়ে হাসলেন।

সমবেত মেয়েদের কানে কথাটা খট ক'রে লাগল।

হিতেনের কানেও গেল। মস্ত ভুল হয়ে গেছে, আর একটা বড় বিষয়—জাত এতটা পরিমাণ।

এবারে আর মার নিশ্চিন্ত থাকবার সময় নেই। হিতেনের জ্যেঠতুতো ভাইয়েরা আসতে লাগলেন। জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ সকলেই।

এক দাদা বললেন, বললে তো বোঝে না লোকে এখন, আসল কথা হচ্ছে ঘর ও বংশ। লেখাপড়াই বা কি হবে, রূপই বা কি কাজে লাগে! এই তো তোমাদের বউ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর এক ভাই ছিলেন, বললেন, তা লেখাপড়া একটু জানা ভাল; ধর, চিঠির ঠিকানাটা লিখলে। কিন্তু ভাল কাজ করে, এমন শ্বশুর মুরুব্বি হওয়াও দরকার। বিয়ে—মানে সব দেখেই করা উচিত।

দাদাদের এক বন্ধু ছিলেন, বললেন, আসল কথা কিন্তু মশাই গৃহকর্ম, ও না পারলে একেবারে বাজে, 'হেল' আর কি!

দাদা অট্টহাস্যে বললেন, আরে, ও তো সদ্‌বংশের মেয়ে হ'লেই জানবে, জানা কথা।

কন্যাদায়গ্রস্ত শ্বশুরের উমেদার পিসতুতো ভাই ছিলেন, তিনি বললেন, স্বাস্থ্যটিও দেখা দরকার। এই দেখ না, ওদের অমুকের (কোন জানাশোনা) স্ত্রীটি রুগ্ন, বারো মাস ছেলেমেয়ের লেপ কাঁথা ওষুধ-বিষুধ সব নিজের ঘাড়ে।

ওঁদের সবারই সদ্‌বংশজাতা, পরিমিতশিক্ষিতা, গৃহকর্ম্মদক্ষা, অশিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী—প্রকারান্তরে নিজের নিজের গৃহলক্ষ্মীর প্রতি মুগ্ধ সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা মাথা নীচু ক'রে হিতেন শুনছিল।

সঙ্গে সঙ্গে বউদিদিদের টিকলো, থাঁদা, মাঝারি, ফরসা, শ্যাম, গৌর, ডিম্বাকার, পানমত, চন্দ্রমুখ, তাঁদের অপরিচ্ছন্ন, পরিমিত, অপরিমিত প্যানপেনে সন্তানাদিসহ সারি সারি ছবি তার চোখের সামনে ভেসে গেল।

সেই দুর্ভাগা স্বামীর কাঁথা শুকোতে দেওয়ার একটা মানস-দৃশ্য দেখা গেল।

ভাবতে ভাবতে কয়েকদিনের মধ্যেই অকস্মাৎ কেমন ক'রে পিসতুতো বউদির অতিশয় স্বাস্থ্যবতী গৌরবর্ণা নৃত্যকুশলা মিতচক্ষু-নাসিকাযুক্তা পরিমিতবিদ্যাবতীর বিবাহ-সভায় দাদারা সকলে মিলে হিতেনকে নিয়ে গিয়ে বিবাহ দিয়ে দিলেন।

হিতেন যথারীতি স্ত্রী-আচারে দাঁড়াল। শুভদৃষ্টিতে চাইলে। সম্প্রদান সংগ্রহণ করলে। বাসরে জাগল ও ঘুমোল।

শুধু মনের দুষ্ট সাহিত্যিক কোণে একবার হাসি এসেছিল এই বিশেষ স্বাস্থ্যবতীর নৃত্যকুশলতার কথা ভেবে।

গবেষণাতে আর একটা ইঙ্গিত—হিন্দুপ্রেম তথা বিবাহ অনির্ব্বাচিত বা স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত বহুনির্ব্বাচিত। একবার মনে হ'ল, সে যদি ডাক্তার হ'ত, এই গবেষণাটা বেশ ডাক্তারী অনুপানের চিহ্ন দিয়ে সাজানো যেত।

কয়েকটা বছর গেছে।

পাড়াতে ছেলেরা নতুন একখানা সাপ্তাহিক কি মাসিক কাগজ বের করছে। তারা এখনকার আধুনিক।

হিতেনদা, একটা লেখা দাও না? তারা সেই পুরোনো লেখাটি প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিল।

ওরে, এখন যে অনেকদিন লিখি নি।

তা হোক, বেশ তো লিখতে—পড়লাম।

সাহিত্যিক মন তার প্রশংসাতে পুলকিত হয়ে উঠল।

কোন্‌টা? কবেকার?

সেই যে, সেই 'সর্ব্বান্বিতা'-তে।

ওঃ, আচ্ছা, চেষ্টা করব। আসিস।

হিতেনের শরীরে সেবাপ্রাপ্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও স্নিগ্ধতা, কিঞ্চিৎ স্থূলতাও। স্ত্রী তাকে অতিশয় ভক্তিভাবে ভালবাসে। না প'ড়ে, উপবাস ক'রে সরস্বতী-পূজার দিন নিষ্ঠাভরে বাণীকে অঞ্জলি দেওয়ার মত গভীর নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তি, এবং ওর মনে সেই ভক্তিজনিত শান্তি ও সান্ত্বনা। বন্ধুদের ও সাহিত্য-সমালোচনার ধারে বুদ্ধির যে কোণগুলো তীক্ষ্ণ ছিল, ভক্তির বিপুল ভারে সেগুলো মসৃণ হয়ে গেছে।

পুরোনো 'সর্ব্বান্বিতা' একটা পাওয়া গেল না। পুরোনো মাসিকপত্র যা ছিল, খোকা ও খুকীদের দুধ গরম করতে লেগে গেছে।

মনে এল, তাতে ছিল প্রেমের কথা।

হ্যাঁ, কিন্তু—কিছু বিশেষভাবে মনে পড়ে না তেমন।

হিতেন আরম্ভ করলে, আমাদের দেশের প্রেম—অর্থাৎ হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ভাবের সহায়ক প্রেম ও বিবাহ। এবং তার আদর্শ।

এবং সেই সম্পর্কে আধুনিক সমাজে আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতা লোপের আশঙ্কা।…এবং এই সম্বন্ধে কঠোর ও বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার।…

কেন না এই প্রেম পাশ্চাত্য জাতের মত ভোগসর্ব্বস্ব বা ঐহিক নহে।…

হিতেনের অল্প কোঁকড়ানো পরিষ্কার তোলা চুলের মাঝে কানের দিকে গোটাকতক রূপালী চুল দেখা যাচ্ছিল।

টেবিলের ওপর দেওয়ালে ১৯৩৫ সালের ক্যালেণ্ডার একখানা টাঙানো ছিল। শতাব্দীর ত্রিশের কোঠা পার হয়েছে।

হিতেন লেখে—হাঁ, হিন্দুপ্রেমের লক্ষ্য? কি? কি লক্ষ্য? হিন্দু-প্রেমের লক্ষ্য তথা বিবাহের লক্ষ্য ইহলোকে নয়—পরলোকে।

তিন জন

একটি নারী হলেন—স্ত্রীলোক; দুটি মেয়ে মানে—গল্পগুজব, কথালাপ; আর তিনটি নারী লেখা মানে—কলহ-কোলাহল। চীনে ভাষার অভিনব চিত্রকলা-পদ্ধতি-অনুগামী বর্ণমালা নাকি এই রকম।

মা ছিলেন না, ছিলেন বুড়ো বাপ, আর তিন মেয়ে। বড়টি বিধবা; মেজটিকে শ্বশুর-বাড়িতে পীড়ন করে, সে যায় না; ছোট অবিবাহিতা। বড়র নাম কমলমণি, মেজ কাদম্বিনী, ছোট কুমুদিনী।

বাবাকে ওরা সকলেই খুব ভালবাসে এবং ভয় করে না একটুও। গল্প করে, শাসন করে, সেবা করে; যেন তিন মায়ের একটি ছেলে। ফলে, অসুখ করলে টক্কর দিয়ে সেবা করে। পিকদানিটা, চিলিমচিটা, জলের ঘটিটা নিয়ে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়। বিছানার চাদর কাপড় বদলানো নিয়ে, পায়ে মাথায় হাত বোলানো নিয়ে তিন বোনে কথা কওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাপের শারীরিক অসুখ ভুলে গিয়ে মানসিকটা এমন প্রবলতম হয়ে ওঠে যে, বেচারা পারতপক্ষে কন্যাদের জানান না।

কুমুদিনীকেও ভালবাসে দুই বোনে। মেজর সঙ্গে ভাব, বড়র আছে কন্যা-স্নেহ। মেজর খেলার সাথী, বড়র হাতে ক'রে মানুষ করা—মাতৃহীনাকে। কুমু একবার ধাক্কা খায় মেজদিদির কাছ থেকে, আবার খায় বড়দিদির কাছ থেকে।

কুমুর হয় নি বিয়ে, আর বাপের ছিল স্থায়ী বাত; কাজেই আন্দোলন-দোলনের শেষ ছিল না। কথা হয় দুই বড়তে; সব বড়র কাছে পৌঁছয়; সব ছোট হয় সাক্ষী; বাপ সাক্ষীগোপাল হয়ে চেয়ে থাকেন।

ভাবেন, আহা, ওটা বিধবা মানুষ, চিরদুঃখী। মেজকে শাশুড়ী যা

কষ্ট দেয়—কবে যে স্বামীটা সুবুদ্ধি ক'রে ওকে আগলাবে। দুই বোনেই রাগ করে, কাঁদে, কালবোশেখীর মতন আসে, বাপের মন অন্ধকার ক'রে দিয়ে চ'লে যায়।

কুমু পান সাজছে। মেজদি রান্নাঘরের যোগাড় দিতে ব্যস্ত। বড়দি পূজায় বসেছেন।

হঠাৎ একটা 'উহুহু' শোনা গেল। কুমুদিনী কাছের ঘরেই ছিল। কি বাবা, কি হ'ল?—বাপের ঘরে প্রবেশ করলে। গোলমালের ভয়ে বেচারা বৃদ্ধ দিন তিনেক অতি কষ্টে চুপ ক'রে ছিলেন, কষ্টটা বেড়েছে—সেদিন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

না রে, আবার হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে।

কুমু ব্যস্ত হয়ে বললে, হাত বুলিয়ে দোব বাবা? সেক দোব?

না না। হৈ হৈ করিস নি। একটা মাষতেল আনিয়েছি, তাতেই কমবে 'খন। কাজ নেই গোল ক'রে।

বাতের ব্যথা, তখন অমাবস্যার কাছাকাছি, চিড়িক মারতে আরম্ভ করেছে, ওঠবার চেষ্টামাত্রেই একেবারে 'আহাহাঃ' ব'লে মুখটা কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

কুমুদিনী বিনা বাক্যব্যয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল, বড়দি তখনও পূজায়, মেজদি তরকারির ঝুড়িতে বেষ্টিত হয়ে ব'সে কুটনো কুটছিল।

ভাই, বাবার আবার হাঁটুটা টাটিয়েছে। কক্ষেপ হয় নি, না? একটু মালিশ করি?

মেজদি বললেন, একটু সেকও দে না, কমবে 'খন। চল, আমারও হয়েছে।

একটা মালসায় ক'রে কাঠকয়লার আগুন তৈরি হচ্ছে। কমলমণির পুজো হ'ল, তাম্রকুণ্ডখানি হাতে ক'রে তুলসীমূলে জল ঢালতে এলেন।

মালসাটি একবার নিরীক্ষণ ক'রে নীরবে সূর্য্যমন্ত্র পাঠ, সূর্য্যপ্রণাম ক'রে জলটুকু তুলসীতলে ঢেলে বললেন, কি রে কুমু, আগুন কেন ?

বাবার আবার এতদিন পরে বাতের বেদনাটা দেখা দিয়েছে। মেজদি বললে, সেক দিয়ে দে।

কুমু ক্ষিপ্র হাতে পাখার বাতাস দিয়ে আগুনটা গনগনে ক'রে তোলবার চেষ্টা করছিল। বাবার চাকর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু সে নিজেই বাতাস দিতে লাগল।

কমলমণি বললেন, ও শুকনো সেকে তো বেশি কমবে না, ঠাকুরকে খানিক জল বসিয়ে দিতে বলগে। একেবারে 'কম্পোরেস' ক'রে দিইগে। বাবা কোথায়—ঘরে, না বৈঠকখানায় ?

ঘরে আছেন।—ব'লে কুমু দিদির আদেশ প্রতিপালন করতে রান্নাঘরে ঢুকল।

কুমু ঠাকুরকে জলের কথা বললে। কাদম্বিনী বাবার জন্যে শাকের ঘণ্ট রান্না দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, বললেন, কি রে কুমু, জল কেন ? বাবা এই বাতের ওপর নাইবেন ? ক্ষেপেছিস ?

কুমু বললে, না, বড়দি বললেন, কম্প্রেস করতে। শুকনো সেক দিলে কমবে না।

আহা, চিরটা কাল গেল—লোকে সেক দেয়, মালিশ করে ব্যথার জায়গায়, আর আজ কমবে না ? বলে, হারিকেনের আলোর ওপর নেকড়া তাতিয়ে কত সেক দিয়েছি, কমে নি তাতে ?

পেছন থেকে বড়দি বললেন, তা, তাই দে না, এটাতে কমত, উপকার হ'ত, এই আর কি !

কমলমণি গম্ভীর মুখে নিরামিষ-ঘরে প্রবেশ করলেন, ঠাকুরকে আদেশ দিলেন জল নামিয়ে নিতে।

বিকেল গেল, সন্ধ্যে কাটল, বড় মেয়ে আর ঘরে ঢুকলেন না। বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, হ্যাঁরে কুমু, তোর দিদি কই? কি হ'ল আজ? কোথাও দেখাশোনা করতে গেছে নাকি?

বৃদ্ধ 'উহুহুঃ' ক'রে উঠলেন।

কুমু ধুনো দিতে ঘরে ঢুকেছিল, তোমার কষ্ট কমে নি তো বাবা! দিদির কথা বলছ? আছেন তো।

ওঃ। ব্যথাটা আছে বইকি। বৃদ্ধ হাঁটুটিকে এমন কোন রকম ক'রে রাখবার চেষ্টা করছিলেন, যাতে আরাম পান; কিন্তু প্রতিকারের প্রচেষ্টাতেই আরামের 'আঃ' স্থলে আর্ত্তনাদের 'উঃ' বেরিয়ে আসে।

কুমু রান্নাঘরে প্রবেশ করলে, দিদি নেই, মেজদি আছেন, সান্ধ্য তরকারি কোটা হচ্ছে।

দিদি কোথায়, ভাই? বাবার এ বেলাও কষ্ট হচ্ছে খুব।

কি জানি, বোধ হয় সন্ধ্যে করছে। তা তুই একটু বাতবিজয় তেলটা মালিশ কর না। আচ্ছা, আমিও যাই।

আগুন এল কড়ায় ক'রে, নেকড়ায় বেঁধে তুলো; দুখানি আসন পেতে দুই বোনে আগুনের দুধারে ব'সে গল্প করতে করতে একজন তেল-হাত গরম ক'রে, অপরা তুলো গরম ক'রে বেদনাস্থলে লাগিয়ে দিতে লাগল।

মৃদু গুঞ্জন, গল্প, হাসি আর বাপের সেবা চলতে লাগল।

কমলমণির সন্ধ্যে করা শেষ হয়েছিল। হাসি-গল্পের উচ্ছ্বাসে বিরক্ত হয়ে গম্ভীর মুখে ঘরে প্রবেশ ক'রে কনিষ্ঠার দিকে চেয়ে শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা কি খাবেন?

বৃদ্ধ বোধ হয় আরামে অথবা তন্দ্রায় চোখ বুজে ছিলেন, শশব্যস্তে চোখ খুলে বললেন, ব্যথাটা তো কিছু কমল না মা, কি করি বল তো?

ঐ তো সেঁক-তাপ বেশ হচ্ছে, ওতেই কমবে 'খন। কি খাবে এ বেলা ?

বাতের ব্যথার চেয়ে মনে ব্যথিত হয়ে বৃদ্ধ বললেন, থাকগে, আজ কিছু আর খাব না এ বেলা।

অপর দুই কন্যার দিকে চেয়ে বললেন, আমার গরম হচ্ছে, থাক এবার।

পিতা অভুক্ত থাকবেন, কমলমণির রাগ প'ড়ে গেল। না না, সে কি! শুকনো কিছু খেও না হয়, একটু দুধ-মিষ্টিই নয় খেও। জ্বর হয় নি তো ?

বসনের শুচিতার জন্য অস্পৃশ্য না থেকে পিতার ললাট স্পর্শ ক'রে দেখলেন, না, জ্বর কোথা ? বুড়ো মানুষ রাত-উপসী থাকলে যে ঘুমোতে পারবে না। একটু কিছু খেও 'খন।

কুমু বলছিল কম্প্রেসের কথা, তা দিবি একটু ক'রে ? সেবারে তাতে কমেছিল। যদি কমে তো পরে খাব 'খন।

স্নেহকাতর ব্যাকুল বৃদ্ধ অভিমানিনী দুহিতাকে একেবারে জল ক'রে দিলেন।

আর রাগ চলে না।

চাকরকে জল চড়াতে ব'লে কুমুকে নিয়ে সেঁকের পর কম্প্রেস আরম্ভ হ'ল।

এমনই ক'রে একবার ক'রে বাতের প্রকোপ, একবার ক'রে কুমুর বিবাহের প্রচেষ্টা এবং ঐ বিষয়ে কথা আর কথান্তরে পিতা-পুত্রীদের দিনগত পাপক্ষয় হয়। মতের মিলে কাটে দুদিন, তো অমিলে এক পক্ষ কেটে যায়।

বাত যদি কমে তো কেমন হৈ হৈ ক'রে সকালে কমলমণি, বিকালে

কাদম্বিনী এসে বসেন বাপের কাছে ; কুমুর দিকে আর চাওয়া যায় না, আঠারো পার হয়ে গেল, হ'লই বা এখনকার দিন, চুপ ক'রে থাকাই কি ঠিক হচ্ছে, ইত্যাদি।

ব্যাকুল পিতা অন্যমনে তামাক খেতে খেতে দিগন্তের পানে চেয়ে থাকেন। দূর বৃক্ষশ্রেণীর কুন্তলে দিক্‌চক্রবালে নীল আকাশের উত্তরীয় এসে ঠেকেছে, আর একটু এ নীচু আর ও উঁচু হ'লে এ এসে ওর ললাট স্পর্শ ক'রে যাবে।

সাজা তামাক নিবে যায়, টেনেই ডাক দেন, ও বিষ্টু, একটু তামাক দে না রে।

কানে আসে তিন বোনের বিতর্ক-বিতণ্ডা। ব্যাকুলতায় অন্তর ভ'রে ওঠে, দীর্ঘকাল পরলোকগতা পত্নীকে মনে পড়ে। কবে একসঙ্গে পঠিত "তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে" মনে প'ড়ে যায়। বার্দ্ধক্যের শুষ্ক চোখে জলও আসে না ; নিশ্বাস পড়ে শুধু।

ঠাকুর এসে ভাত দেয়, কমলমণি মার মতন পাখা হাতে বসেন, কাদম্বিনী ঠাকুরের হেঁসেলের তদারক করেন, কুমু দুধ মিষ্টি আনে—এই নিয়ম।

যেদিন ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ বোনেদের মধ্যে একজন অনুপস্থিত থাকে, সেদিন আর বৃদ্ধের ভাল ক'রে আহার হয় না।

এদিক ওদিক চান, কার প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু ভয়ে জিজ্ঞাসাও করেন না। পাছে স্নেহের মানদণ্ডে কোন দিক ভারী মনে ক'রে আবার কারও কিছু হয়।

যাই হোক, কুমুর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। দুই বোনের বাপের সমান আনন্দ।

হ্যাঁ মা, তা হ'লে এবারে চল, কাশীতে গিয়ে থাকিগে।

বালবিধবা জ্যেষ্ঠাকে 'মা' বলা তাঁর অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

মেজ চুপ ক'রে উঠে গেলেন।

কমলমণি বলেন, পুঁটি কোথায় থাকবে? আদর দিয়ে মাথাটা খেলে বাবা ওর। দাও এবারে পাঠিয়ে—এখন তো আর ছেলেমানুষটি নেই।

বৃদ্ধ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, সেখানে যে শাশুড়ীটা বড় দুর্দ্দান্ত মা। তাই তো ওর কথা আমি অত ভাবি নি।

তা ওকে নিয়ে তো কাশীবাস হবে না। আমার তো সব চুকে গেছে, আর থাকত যদি একটা কেউ পুড়িয়ে খেতে, তা হ'লে কি ছাই—

বাপ চারদিকে চেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। মনে হয়, কাদম্বিনী বেচারা কি মনে করবে। খেতে আর দেরি হয় না, উঠে পড়েন।

কুমু ফিরেছে শ্বশুর-বাড়ি থেকে।

নিরামিষের উনুনে পিতার আর জ্যেষ্ঠার জন্য রাত্রির দুধ মিষ্টি ক্ষীর ইত্যাদি করতে করতে কাদম্বিনীর চোখ অকারণেই সজল হয়ে আসে।

ক্ষীর যায় এঁকে; সন্দেশ কোন দিন হয় কড়াপাক, কোন দিন কাঁচাপাক; অন্য মিষ্টির ভেতর আঁটি জন্মায়।

কুমু এল পানের বাক্স নিয়ে, ভাই, কি করছিস? একটু সুপুরি কাট না। তোর চোখে ধোঁয়া লাগল কোত্থেকে?

কি জানি! মধ্যমা সুপারির পেতেটি নিলেন। চোখ আপনিই নীচু হয়ে থাকে।

কুমুর বোঝার পক্ষে বয়স খুব হয়েছে, তাই ছেলেমানুষ থাকা ভাল,

এ জ্ঞানটাও আছে। কুমুর গল্পের স্রোত বইল। কাদম্বিনী শ্রোতা ভাল, নীরবে শোনেন। ওঁর মনের অতলান্তিক সাগরের থই পাওয়া যায় না।

আচম্বিতে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ ভাই, তোর শ্বশুর-বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না? সিংগি মশাই তো লোক মন্দ নয়।

নামটা তার রমেশ, কিন্তু দিদির মুখে হাসি আনবার জন্যে কুমু তাকে সিংগি মশাই বললে।

দিদি একটুখানি হাসলেন, বললেন, তুই দেখ না ঘর ক'রে।

যাঃ!—ব'লে কুমু পান নিয়ে উঠে গেল।

বাবাকে খাবার দেওয়া হ'ল।

কমলমণির বার্দ্ধক্যের সীমায় পৌছবার এতই সাধ যে, তিনি কুমুর বিবাহের পর মালা করতে করতে বৃদ্ধা পিতামহীর মত বাপের কাছে এসে দাঁড়ান। চুলগুলি দিন দিন আরও ছোট ক'রে কাটেন। মুখখানি প্রসন্ন অথচ এমনই গম্ভীর, তাঁকে বাপ ভয় করতেন ভারী, এগারোয় বিবাহ এবং বিধবা হয়ে এক নিয়মে ত্রিশ বছর বয়স হ'ল, তাঁর আর কিছুতেই নিজেকে ছোট মনে হয় না; যে কদিন মা ছিলেন, সেই কদিন মাত্র তিনি দুহিতা ছিল। এখন একেবারে পিতামহীর আসনে বসেছেন যেন। তা হ'লে কি করবে ঠিক করলে?—মুলতুবী রাখা কবেকার কথা হঠাৎ এনে গম্ভীর মুখে তিনি বাপের দিকে চাইলেন।

কিসের মা?—বাপ জিজ্ঞেস করলেন।

এই কুমী তো যাবে আশ্বিন মাসে। পুঁটীকে কি করবে? আমাদের যে কাশী যাবার কথা বলছিলে না?

পিতার তরকারি রইল প'ড়ে, ভাজা দিয়ে খেয়েই চট ক'রে দুধের বাটিতে হাত দিলেন।

কুমু বললে, ওকি বাবা। তরকারিটা নাও, ও যে নতুন কুমড়োতে পটল দিয়ে তোমার জন্যেই করেছে।

বাবা নীরবে দুধ সরিয়ে আবার তরকারিতে হাত দিলেন।

তা তুমি একখানা ওদের চিঠি লেখ—রমেশকে। এই তো সেদিন কুমীর বিয়ের সময় এসেছিল, কেমন কথাবার্ত্তা। মা ছাই তো—বউ ঘর করবে না! এমন কথাও শুনি নি! আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আজ বাদে কাল কাশীবাস করব, ওকে নিয়ে কোথায় যাবে?

বাপ বর্ষীয়সীপদাভিলাষিণী আবাল্যব্রহ্মচারিণী দুহিতার মুখের পানে একবার চাইলেন।

কাদম্বিনী এসেছিলেন মিষ্টি নিয়ে, একবার বাপের মুখপানে চাইলেন।

বাপও চেয়ে চোখ নীচু ক'রে ছিলেন।

কুমু গেল পান নিতে। কাদম্বিনী অন্ধকারে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। আমাকে তাড়ালেই তোরা বাঁচিস। দিদি ভাবেন, আমার জন্যেই সব অসুবিধে।

দিদি এসে পড়লেন, কুমী, বাবার থালাখানা নিয়ে এসে খেতে ব'স।

মধ্যমার দিকে চেয়ে বললেন, কি মন্দ বলিছি? ঘরকন্না করতে হবে তো! বুড়ো বাপকে ভাজাভাজা করলি—ভাবিয়ে মারছিস, বুঝিস না?

আমিই কি সব দিকে ভার হয়েছি!—কাদম্বিনী উঠে গেলেন।

কুমুর বিয়ে যদি হয়ে গেছে তো কাদম্বিনী-সমস্যা বাতের প্রকোপের সঙ্গে পাল্লা দেয়।

দুই বোনে কথা বন্ধ হয়ে যায়, কুমু একবার এদিক একবার ওদিক করে। আবার কেমন ক'রে মিল হয়ে যায়।

আশ্বিনের প্রভাত। বর্ষার ধারাস্নানজলে দীঘি পুকুর ভ'রে গেছে। গাছপালা তখনও অপরূপ স্নিগ্ধ ধৌত শ্যাম।

কুমু সকালের ডাকে একখানা চিঠি পেয়েছে। সেই নিয়ে চিলের কুঠুরির পাশে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মেজদিদি স্নানান্তে সিক্ত বস্ত্র শুকোতে দিতে উঠল।

আস্তে আস্তে ভগিনীর পেছনে দাঁড়িয়ে স্নেহমধুর হাস্যে বললে, তাই বলি—! এখনও নাস নি তো?

দিদি ডাকলেন, ও কুমী, নাব না। পুঁটীকেও ডাক।

রমেশের পত্রোত্তরে পুঁটীর শাশুড়ীর পীড়ার সংবাদ এসেছে বাপের কাছে, ওকে আজই যেতে হবে। ঘোষালকাকা দিয়ে আসবেন। এই ব্যাপার।

কাদম্বিনী অসহায়ের মতন ব্যাকুলভাবে চুপ ক'রে রইল। দীর্ঘ-নির্ব্বাসিত শ্বশুরালয় বেচারীকে ভয় ভাবনা ভরসাতে সমানভাবে অভিভূত করতে লাগল।

কুমু বাক্স গোছাতে, কাপড় খুঁজে রাখতে বসল। আপনার জামা কাপড় এনে সে দিদির বাক্স গোছাতে লাগল।

কমলমণির মনে হ'ল, পুঁটী ছোটবেলায় টেপারি খেতে ভালবাসত, ইলিসমাছ ভেটকিমাছের ঝাল, বড়ার অম্বল, ভাজা বড়ি, কুলের আচার, কাঁচামিঠে আম, ওঁর হাতে[illegible] মিষ্টি আমের আচার—আহা, কুল তো সে মাঘ মাসে! এবারে কি[illegible] আচারই কিছু করা হ'ল যে, থাকবে ঘরে! কুমীর বিয়ের হুজুগে কি[illegible]শ্বাস ফেলবার সময় ছিল!

কবে একদিন পু[illegible] বলেছিল, দিদির মত ঘণ্ট রাঁধতে কেউ পারে না, ছানার মুড়কি ক[illegible] কতদিন আগে একবার করতে বলেছিল! পোড়া বুদ্ধি, একদিন দুদিন সময় দেয় লোকে, তা না আজই! সেই কাশীতে,

সে কি আর পাঠাবে! দিদির অন্যমনে স্তূপে স্তূপে তরকারি কোটা হ'ল।

কুমু এসে বললে, একি দিদি! জামাইবাবু আসবেন নাকি?

জ্যেষ্ঠার দূর অতীত স্বপ্নে ভরা দৃষ্টি সজল হয়ে এল, বললে, না, এমনি।

তিন বোনে খেতে বসল।

কোথায় চিরসঙ্গোপন স্নেহকাতর মনটি কেবলই কি যেন বলতে চায়। কথা খুঁজে পায় না। পুঁটী, আর দুটি ভাত নে? মাছ আর একটু দিতে বলি? হ্যাঁ রে, টকটা কেমন রেঁধেছে? ঘণ্ট ভালবাসিস, তা তেমন আর মনের মত মোচা পেলাম না। হ্যাঁ রে কুমু, দিদির আলতা সিঁদুর রেখেছিস গুছিয়ে? সবটা দই পাতের করিস নি যেন, আর তোর একটা রাঙাপাড় কাপড় পরিয়ে দিস। ওরে, আচারটুকু নে, ও যে বোসগিন্নীর কাছ থেকে চেয়ে আনালাম।

দিদি একলাই বক্তা। কুমু কাদম্বিনী উঠে পড়ল নীরবেই। চোখ আর ওঠে না। তিনটেয় গাড়ি, ঘোষালকাকা দেড়টা থেকে তাড়া দিচ্ছেন, সেই কাটোয়া—

কাদম্বিনীকে চুল বেঁধে আলতা পরিয়ে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হ'ল।

বাপকে প্রণাম ক'রে তিনি দাঁড়ালেন, বাপ কম্পিত স্বরে কি বললেন, কি আশীর্ব্বাদ করলেন, বোঝা গেল না। কু[illegible] জড়িয়ে ধরল।

কমলমণি এদিক ওদিক জিনিসপত্র—বা[illegible]সা মিছরি ফল ওর রোগা শাশুড়ীর জন্যে সব দিতে ব্যস্ত। ঠিক পূর্ব্ব মুহূ[illegible] সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। বোন প্রণাম ক'রে চোখ মুছে গাড়িতে উঠলেন'

ঠিক ততখানিই উৎকণ্ঠার সহিত কমলমণি [illegible] ভাঁড়ারে ঢুকলেন, কোথায় কি তিনি তো জানেন না, সেই সব রাখত যে!

সন্ধ্যে আর হয় না। সন্ধ্যের আগেই কাপড় কেচে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। জপ হ'ল আজ দ্বিগুণ, মালা কতবার কে জানে!

গুলি মন্থর হয়ে—তিন বোন, বাল্যকাল, মা বাপ, সুখ দুঃখ কলহ, শান্তি, বেদনা, স্বপ্নের স্মৃতি ব'য়ে ক্রমাগত কমলমণিকে পরিক্রমণ ক'রে যেতে লাগল।

সন্ন্যাসী

দাউজীর (গোপাল-বলরামের) মন্দিরের প্রকাণ্ড চাতাল। যমুনার তীর থেকে বেশি দূর নয়। স্নানান্তে সকলেই উঠে আসে, প্রণাম ক'রে শিবের মাথায় জল দিয়ে ফল ফুল পয়সা বাতাসা রেখে চ'লে যায়।

সেদিন মন্দিরের চাতালে একটি সাধু এসে বসলেন। পরিধানে গৈরিক, মাথাটি মুণ্ডিত, বয়স বোঝা যায় না, স্নিগ্ধ সহাস্য মুখ, মধুর মিষ্ট কথা।

গিরি, নদী, বন, অরণ্যের সম্পর্কীয় কেউ কি না, কেউ জানতে পারে না, কিন্তু অরণ্য প্রান্তর সাগর ঘুরেছেন খুব—বোঝা যাচ্ছিল কথার ভাবে। মন্দিরের কর্ম্মচারী চাকরের সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন।

মন্দিরের এক পাশের দিকে ব'সে তিনি মৃদুস্বরে ভজন করছিলেন।

আস্তে আস্তে দুটি একটি ক'রে মেয়েরা এসে দাঁড়াল, বর্ষীয়সীরা সস্নেহে 'বাবা' ব'লে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন।

একে একে পাঁচ-সাতজন নানা বয়সের মেয়েরা এসে দাঁড়াল। সবাই প্রণাম ক'রে পয়সা রেখে ফল রেখে চ'লে গেল।

ভিড় হয় নারীরই বেশি। সকালে যারা আসে স্নান করতে, সন্ধ্যায় যারা আসে আরতি দেখতে, তারা সাধু মহাত্মা দেখলেই এসে দাঁড়ায়। কারুর অসুখ, কারুর ছেলে-মেয়ের অসুখ, কারুর ছেলের কাজ, কারুর বউ-মেয়ের বন্ধ্যাতা, নানাবিধ দুর্ভাগ্যকে [illegible] মন্ত্রশক্তিতে সৌভাগ্য করা যায় কি না তারই আবেদন-নিবেদন আসে।

শূল-বেদনার কবচ, বন্ধ্যাতার মাদুলি, চাকরির জন্য জপ ইত্যাদির আবেদন-নিবেদনে সাধুর ভজন-পূজা সংক্ষেপ হয়েছিল।

ভিড়ের শেষ থাকে না, ক্রমে পুরুষেরাও এসে দাঁড়াতে লাগল।

কেউ বা 'ভভূত,' বিভূতি, কেউ বা পায়ের ধুলো নিয়ে যায়। গুজরাটী, পাঞ্জাবী, শিখ, বেনিয়া, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, পর্দ্দানশীন সব জাতীয় মেয়ে এসে করযোড়ে মহাৎমাকে দর্শন ক'রে কথা শোনে। সাধু মহাৎমার কাছে পর্দ্দা নেই।

দুটি পাঞ্জাবী মেয়ে এল। একটি বর্ষীয়সী, অপরা তার মেয়ে—অল্প বয়স, অতি ক্ষীণাঙ্গী সুন্দরী—যেন অপরূপ শ্রী-লেখা।

মা বললে, বাবা, এর জ্বর কাসি, ছাতিমে দরদ, এই ছ মাস হয়েছে সারে না, আপনি একে ওষুধ দিন, যদি সারে। অনেক ইলাজ—চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু সারে না, আপনার কৃপা হ'লেই আরাম হবে।

মেয়েটির ক্ষীণ শীর্ণ স্বচ্ছ সৌন্দর্য্যে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, তার কি অসুখ। মহাত্মা শুধু তার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর যা বললেন, তার মর্ম্ম এই, ওর অসুখ ভাল হবে না।

ব্যাকুল জননী তবু হাতযোড় ক'রে পায়ের ওপর মাথা রাখে, মহারাজের কৃপায় কি না হয়, কি না হতে পারে! সে শুনবে না, তাকে ওষুধ কবচ যা হয় কিছু দিতেই হবে, একটি মাত্র মেয়ে তার, একটি ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছে, সে না বাঁচলে ও পাগল হয়ে যাবে ইত্যাদি—চোখের জল কথার স্বর দুইই সন্ন্যাসীর চরণ আর মনকে অভিষিক্ত ক'রে তুলছিল।

মেয়েটি চুপ ক'রে মন্দিরের থামে ঠেস দিয়ে ব'সে ছিল চোখ বুজে, হয়তো তার জ্বরে চোখ জ্বা[illegible]রছিল, নয়তো ক্লান্তিতে।

সন্ন্যাসী বললেন, আ[illegible]া, ওষুধ দেখব।

মা মেয়ে চ'লে গেল।

সকাল সন্ধ্যা বি[illegible] রাত্রি সব সময়েই ভিড়ের শেষ নেই। সবাই আসে—পুরুষেরা আ[illegible], মেয়েরা আসে। কারুর হাতে খাবারের থালা,

কারুর হাতে ফুলের মালা, কারুর হাতে বা আতর চন্দন, কেউ নববস্ত্র টাকা পয়সা, প্রাণামি তো আছেই।

ভক্তেরা ক্রমশ মালা এনে পরিয়ে দেয়, আগে শুধু পায়ে ঠেকাত। চন্দন-সুগন্ধে মাথা কপাল চর্চ্চিত ক'রে দেয়।

সন্ন্যাসী যমুনার তীরে একটি প'ড়ো ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিলেন। ওখানে ভিড় বেশি।

পীড়িত মেয়েটি এসে বিভূতির স্পর্শ নিয়ে যায়, আশীর্ব্বাদ নিয়ে যায়। তার মার বিশ্বাস ওতেই ভাল হবে।

এসে আর ফিরে যেতে তখনই পারে না। চুপ ক'রে ভিড় থেকে দূরে একপাশে ব'সে থাকে। প্রকাণ্ড অশ্বত্থতলায় বাঁধানো বেদীর ওপর ব'সে সে জীবন-মৃত্যুর সেতুর ওপরের স্বপ্ন দেখে। হয়তো যাবে, নয়তো ভাল হবে।

চোখে পড়ে, সন্ন্যাসীর ঘরখানি, জনে জনে প্রণাম ক'রে প্রণামি রেখে ফিরে যাচ্ছে।

বোধ হয় এও চোখে পড়ে, সেবা কখন যত্নের আত্মীয়তার রূপ ধ'রে এসে দাঁড়িয়েছে।

কোন মেয়ে বলে, বাবা, পায়ের থোড়া দবা দে?

কেউ বলে, বাবা, ভোজন করো?

কেউ বলে, আপকো শয্যা বনা দে?

নারীর স্নেহ সেবা, সন্ন্যাসীকে সব [illegible] দিয়ে শত বন্ধনে বাঁধে। কোন দিন হয়তো সে বন্ধন ছিল, যাকে ম[illegible]াড়ে, নয়তো পড়ে না। আজ সব দিক দিয়ে সেই বাঁধনই তাঁকে ন[illegible]রিয়াশের মতন বেঁধে নিচ্ছে যেন। সন্ন্যাসী হয়তো ভাবেন, সে অন্য, এ অ[illegible]ল. নারীরা ভাবে, আহা, কেউ নেই যত্ন করবার!

রাত্রি হয়। সে ওঠে, এসে দাঁড়ায়, বলে, বাবা, অব যা রহেঁ।

আচ্ছা বেটী, যাও।—সন্ন্যাসী কোমল স্নেহে তার পানে চান। সে উপেক্ষাভরে চ'লে যায়।

উদ্ধত, পীড়িত, তীক্ষ্ণ নারীকে তাঁর ভালও লাগে, ভয়ও করে। সমস্ত লোকের মাঝ থেকে ওকে যেন তাঁর বেশি মনে জাগে।

কিন্তু পীড়িত অবস্থাতেও সে না এসে থাকতে পারে না, রোজই আসে। যেন একটা অন্যমুখীনতা, অন্যমনস্কতা। যে প্রাণ ক্রমশ নির্জ্জীব হয়ে আসছে, সে যেন ওই জনতার মাঝে আপনার নির্জ্জীবতাকে সজীব ক'রে তোলে অথবা জীবনের বৈচিত্র্য দেখে।

সেদিন ভিড় কম। সন্ন্যাসী বললেন, বেটী, সবাই আসে, বসে, কত সেবা করে, তুমি কেন অত নির্লিপ্তভাবে থাক ?

সে চুপ ক'রে রইল। তারপর একটু হাসলে, বললে, আপনাকে তো অনেকে সেবা করে, ক্রটি তো হয় না।

সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন—কি ভাবে কথাটি বললে, হয়তো জানবার জন্যে।

সে কথা আমি বলছি না, আমি বলছি, তোমার তো সেবা করবার ইচ্ছে হতে পারে।

সন্ন্যাসীর কথার উত্তর দেবার আগেই কয়েকজন নরনারী এসে দাঁড়াল।

সেবার আয়োজন [illegible] গেল, কেউ করে শয্যা, কেউ করে বাতাস, কেউ বা ফুলের মালা [illegible]য়ে রাখে, কেউ বা আহারের আয়োজন করে।

সব কাজ সারা [illegible]লে যারা গেল, তারা গেল। যারা থাকে, তারা পায়ে হাত বুলোয়, [illegible]তাস করে।

স্বামী স্ত্রী, মা মেয়ে, ভাই বোন কত সম্পর্কের কত জন আসে। সবাই সবচেয়ে আপন জন হয়ে সেবা করতে চায়।

প্রথম প্রথম সাধু ব্যাকুল হয়ে উঠতেন, পায়ে হাত দেবেন না, সেবা করবেন না, ইত্যাদি।

মেয়েরা শোনে না, পুরুষরাও সব সময় শোনে না।

অনভ্যস্ত পরিচর্য্যায় ঘুম আসে না, অস্বাচ্ছন্দ্য আসে বোধ হয়। সন্ন্যাসীর ঘুম আসে না, চুপ ক'রে শুয়ে থাকেন। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে; মনোহর পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু বুঝি ঐ ঘরের প্রাণী কটি ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। শুধু মাঠের গরম হাওয়া উড়ে আসে থেকে থেকে—পাতার মর্ম্মর স্বর তুলে, কোথাকার কোন্ ঘুমের লোকের ওপারের—মনের ওপারের বার্ত্তা ব'য়ে। কিন্তু পরিতৃপ্তি আসে না, কি যেন অবসাদ-বেদনা-শ্রান্তিতে অন্তর ভ'রে ওঠে।

সেবার কিন্তু ফাঁক পড়ে না, জনের পর জন কেউ না কেউ করেই।

সন্ন্যাসী বিনিদ্র অবস্থাতেই থেকে অবশেষে উঠে পড়েন।

মেয়েরা বলে, অওর নেহি লেটেঙ্গে বাবা?

সন্ন্যাসী বলেন, নেহি বেটী, নিদ নেহি আয়া।

রাত্রেও আসে জনে জনে। নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রী দুজন এসে কতক্ষণ ব'সে থাকে।

সবাই ফিরে যায়, ওরা আর ওঠে না।

পীড়িত মেয়েটিও ব'সে থাকে।

তারা পায়ে হাত বুলোতে বসে।

নিয়মিত সেবা যেন সংস্কারকে সহজেই অতিক্রম ক'রে সন্ন্যাসীকে বেষ্টন করেছে। সেবার ঠাস বুনুনি—পার হয়ে যাবার কোনও উপায় বা পথ পাওয়া যায় না যেন।

সন্ধ্যার আকাশে মেঘ গুমট হয়ে ছিল, যমুনায় সঙ্কীর্ণ প্রবাহিণীর জল স্থির কাজলচোখে আকাশকে দেখছিল, আকাশের মেঘের ছায়া জলের বুকে স্থির হয়ে প'ড়ে ছিল।

অনেকেই চ'লে গেছে, শুধু সেই পীড়িত মেয়েটি তার মা আর দু-একজন আছে।

সেবার সমারোহ সাধুকে প্রসন্ন করে, কি ব্যাকুল করে কে জানে; কিন্তু পীড়িত মেয়েটির মুখখানি বাইরের রকে যেন মৃদু হাসিতে ভ'রে ওঠে।

অবশেষে সেবিকার স্বামী বাতাস করছিল, সে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। তার বিধবা বোনও সাধুর পায়ের কাছে ব'সে ছিল।

তার ইচ্ছে, দুজনেই সেবা করে। কিন্তু অপরের ইচ্ছে, সে একলাই করে! দুজনে কি কথা হয়, একজন উঠে যায়।

সাধু অপরকে বললেন, রাত হয়েছে, তুমিও যাও।

যেন একের ক্ষুণ্ণতা তাঁকে অপ্রস্তুত করছিল। শেষ সেবিকাও উঠে গেল।

সেবা-অভ্যস্ততা কদিনের মাত্র, কিন্তু সন্ন্যাসী যেন পুরাতন কাজের গতি ভুলে গেছেন, চুপ ক'রে জেগে শুয়ে রইলেন। রুগ্ন মেয়েটি রকে শুয়ে ছিল।

সে উঠে এল, বললে, [illegible]ারাজ, একটু বসি? অনুমতির অপেক্ষা না ক'রেই মাথার কাছে [illegible]

সাধু অবাক হয়ে ব[illegible], ব'স। কি, বলবে কিছু?

সে চুপ ক'রে র[illegible] তারপর বললে, আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই?

সাধু আরও অবাক হয়ে বললেন, দাও। কিন্তু আজ কেন?

মেয়েটি এবার অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু বললে, মহারাজ, আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?

কেন?—সবিস্ময়ে মহারাজ তার দিকে চাইলেন।

অপ্রস্তুত হয়েই সে বললে, আপনি দেখতে পান না, পেলেন না, ওরা সবাই কত ঝগড়া করে আপনার সেবা নিয়ে। আপনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন কি সংসারে থাকবেন ব'লে? ওরা সবাই আপনাকে আপনার করতে চায়। সে থেমে গেল।

সাধু চুপ ক'রে রইলেন। আপনার কাছে লুকোনো মায়া, মোহ, আকর্ষণ, বেদনা, অভিমান, তৃপ্তি সবগুলো স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল, রাগ বিরাগ আশার সঙ্গে সম্পর্ক তো অনেক দিন ফুরিয়েছে।

মেয়েটি বললে, আপনাদের শুনেছি তিন রাত্রির বেশি কোথাও আশ্রয় নিতে নেই!

সাধু উঠে বললেন, তোমার কথা ঠিক, তুমি আজ আমায় মায়ের মত শিক্ষা দিলে।

সে কি বলতে গেল, নেহি মহারাজ—; কিন্তু বলতে পারলে না। শুধু চুপ ক'রে কোন্ অনাদি জননীর মতন সাধুর মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

রাত্রি গভীর হতে লাগল। ওর মা এসে ডাকলে, কেশর!

সে উঠে প্রণাম ক'রে বললে, আমার অপরাধ নেবেন না।

সারারাত্রি ধ'রে বিনিদ্র সন্ন্যাসীর বেদনার ভাবনার অবধি রইল না। তন্দ্রার মাঝে যমুনা, সরযূ, সুনর, গোদাবরী—সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে কেশরকে, ঐ পীড়িতা মেয়েটিকে। ঘুম [illegible] যায়, মোহ চোখের জলের আকারে চোখ বেয়ে গড়িয়ে আসে।

সকালে সবাই জানলে, সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে যাচ্ছেন, হেঁটে হরিদ্বার যাবেন। তারপর? কিছু ঠিক নেই।

একে একে সকলে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল, দুঃখ ক'রে ব্যথিত হয়ে। কেশরও প্রণাম ক'রে চ'লে গেল।

উষর বন্ধুর উগ্র সৌন্দর্য্যে ভরা পথে সন্ন্যাসী নত মাথায় ভজন গাইতে গাইতে চ'লে যান। পথিক পথে যারা যায় প্রণাম করে, আহার্য্য দেয়, থাকতে বলে গ্রামে। সন্ন্যাসী উদাসভাবে রাত্রের কয়েক দণ্ডের জন্য অতিথি হন। আগে সুখ-দুঃখে সমান উদাস ছিলেন, এখন যেন গভীর ভাবনায় উদাসীন থাকেন। মনে জাগে শীর্ণ ক্ষীণাঙ্গী তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ঐ মেয়েটির কথা। জীবনের কতখানি সহজে অতিক্রম ক'রে এসেছেন, নিজের দিক বিশেষ না ভেবে সব গ্রহণ করেছেন সোজাভাবে ; হঠাৎ একি জাগরণ ! এই প্রতিগ্রহ মায়া, মোহ, মমতা, তৃষ্ণা, ঈর্ষা, বেদনা কত কি সৃষ্টি করেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অতলস্পর্শ সাগরে জাগে একখানি ক্ষীণ তনুর ছায়া, উজ্জ্বল দুটি কালো চোখ, জ্বররক্ত গৌর মুখখানি, শীর্ণ ললিত তনুশ্রী।

পার্ব্বতী, গঙ্গা, ভাগীরথী, যমুনা—সবাই, কতজন এসেছে, কত সেবা করেছে, পুরুষরা কতজন এসেছে, ভক্তি করেছে, সেবা করেছে ; কিন্তু কেশর কিছুই তো করে নি, তবু—

মাঠের মাঝের ছত্রিতে (সমাধি-মন্দির) বিশ্রামের জন্যে ব'সে সন্ন্যাসী স্তব্ধ হয়ে রৌদ্রময়ী পৃথি[illegible]র পানে চেয়ে থাকেন, ভাবেন, উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য কোথায় তাঁর [illegible] ছায়া পড়লে আবার উঠবেন। পথ শুধু, সুদূর দিগন্তসীমা ছাড়ি[illegible] বুঝি শুধু যাত্রা, মহাযাত্রা চিরন্তনী, তার শেষ নেই ; উনি যাত্রী, ত[illegible] একলা, সাথীহীন, সঙ্গীহীন।

আবার মনে [illegible], উদ্দেশ্য ? মনে পড়ল একটা ওঁদেরই উপমা, পেঁয়াজের খোসা [illegible]ড়িয়ে কি থাকে ? হাসতে গিয়ে চোখের পাশ থেকে

জল গড়িয়ে আসে। চোখ খুলে দেখেন, মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে চাওয়া যায় না, চোখ বুজে শুয়ে থাকেন; বহুদিনশ্রুত কবেকার গান মনের মাঝে গুঞ্জন করে—

'বৈরাগ যোগ অতি কঠিন উধো হাম না সাধব হো'

(বৈরাগ্য যোগ অতি কঠিন, হে উদ্ধব, আমি তার সাধনা করব না)

সুরের গুঞ্জনে কেবল ঐ লাইনটিই জাগে মনে।

ব্যাকুল বেদনায় হঠাৎ চমকে চোখ খুলে চান, বেলা আর নেই। ঊষর প্রান্তরের সীমান্তে রাঙা সূর্য্য অস্ত যাচ্ছেন। আপনার দুর্ব্বলতায় বিরক্ত হয়ে সন্ন্যাসী তেমনই রক্তচোখে ঊষর জীবনের মনের প্রান্তরে চাইবার চেষ্টা করেন।

মাতা নয়, ভগিনী নয়, সম্পর্কীয়া কেউই নয়, তবু তাদের সেবা-যত্নের মমতার মায়ার ছাপ মনে যা পড়েছে, কেশর যা ভাবতে শিখিয়েছে, সে আর মোছে না। অবাধ্য মনের কোণে জাগে, নিবিড় ক'রে একান্ত ক'রে স্বজন ক'রে তিনি কারুকে পান নি। না, তিনি নেন নি, সমস্ত ভুবনকে অবজ্ঞা ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মনে হয়, ঠিক করেছেন, না ভুল করেছেন?

আবার চকিত ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, নিষিদ্ধ পরিত্যক্ত অতীতের ভাবনা আবার? বিরক্ত সন্ন্যাসী দ্রুত পায়ে আবার চলতে আরম্ভ করেন। যেন শিগগির চললেই পৃথিবীর সমস্ত পথ, আপনার অয়নচক্র, বর্ষ মাস ঋতুর সীমা অতিক্রম ক'রে, অরণ্য প্রান্তর নগরী সিন্ধু সাগর সব পার হয়ে যেতে পারবেন।

চার ধাম

চিঠি প'ড়ে মার চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগল, আহা! মা-বাপ-হারা অনাথা মেয়েটির কোন দিকের কেউ নেই, বলে যে তিন কুলে কেউ নেই—তাই, কপাল পুড়েছে! বিধাতার এমনই ব্যবস্থা!

মা নিয়ে এলেন। ভাইঝিটির বয়স বেশি নয় পনরো ষোল হবে। কি রূপ! মা কাঁদেন, আহা! এ ছিরি যে থাকাই মিথ্যে, না থাকাই ভাল!

বোঝবার বয়স হয় নি, লোকে বলে। যারা প্রবীণা তারা তাই বলে, আর অনেক রকম 'আহা' জুড়ে দেয়। যারা কম-বয়সী তারাও 'আহা' বলে; কিন্তু মনে জানে, বুঝতে পারে যে, ও নিতান্ত ছোট্ট নয়। কিন্তু এ দুঃখের কি পার আছে?

কিন্তু এই দিদির সঙ্গে মার খোকা নলিনের খুব ভাব হয়ে গেল। এত দিনের মধ্যে সে না পেয়েছে একটি খেলার শান্ত সঙ্গী, না পেয়েছে একটি দিদি বা দাদা। এই পাঁচ ছ বছরের বড়, অসমবয়সী দিদিকে পেয়ে তার আনন্দের সীমা রইল না।

ঘুড়ি ছিঁড়লে দিদি জুড়ে দেয় তখনই, সব রকম খেলাতে নীরবে নির্ব্বিরোধে যোগ দেয়, আবার দুষ্টুমির কথা মাকে ব'লে দেয় না, শুধু শাসায়। আর দিদি[illegible] ছবি দেওয়া বই আছে কেমন—ইত্যাদি দিদির গুণ ঢের।

অন্তত মার [illegible] দিদি সঙ্গী হিসেবে উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নেই। এক আধ বার চড় কি[illegible] মেরেও দেখেছে, দিদি হাসে।

মা ভারী আনন্দিত, নিশ্চিন্ত। যা দুরন্ত ছেলে, একটা দেখবার লোক—; কিন্তু চোখ উপছে জল আসে, আহা, বাছার নিজের কি দশা!

খোকা বা নলিন পনরো বছর পার হয়ে এসেছে। দিদি তাদের বাড়ির সামিল হয়ে গেছে একেবারে; এমন সময়ে মা একদিন বেশ ভাল ক'রে লেপ মুড়ি দিয়ে শুলেন।

দিন দুই-তিনের মধ্যেই কি ভেবে ভাইঝিকে ডেকে বললেন, সবু মা, আর আমি ভাল হব না, তোমরা রইলে—নলিন তোমারই ভরসায় রইল, আমার ডাক এসেছে।

সর্ব্বমঙ্গলা আড়ষ্ট হয়ে পিসীমার হাতখানি ধ'রে ব'সে রইল। ওর উত্তরে কি বলতে পারা যায় বা বলতে হয়, অথবা কি হবে সত্যকার, ওর ধারণাতে যেন এল না। শিশুকাল থেকে অসহায়তার ঝড় ব'য়ে তাকে না ভীরু, না সাহসী, কি এক অদ্ভুত ক'রে রেখেছিল; চোখের কোণে জলও আসতে ভয় পায় হয়তো।

তারপর আর মা বেশিদিন রইলেন না।

সর্ব্বমঙ্গলার কাজ বাড়ল। ওকে দেখবার লোক নেই, কিন্তু নলিনের ষোলো আনা ভার নলিন দিদির ওপর ফেলে দিলে।

সর্ব্বমঙ্গলার হাতে রাত্রিদিনের কর্ম্মচক্র ঘোরে।

নলিনের দিনরাত্রি তার বাল্যকালের লাটিমের মতনই ঘোরে অনায়াসে। ফুটবল, ক্রিকেট ম্যাচ, স্কুল [illegible] কলেজ, দিদির সজাগ মধুর স্নেহ নলিনের জননীর অভাব খুব শীঘ্র[illegible]লিয়ে দিলে। দিনের বেলা তার মাকে মনেই হয় না; স্নান ক'রে [illegible], ফিরে এসে খেলা, তারপর পড়া, রাত্রে শোবার সময় শুধু মনে পড়ে—মা। তাঁর স্নেহস্পর্শহীন শয্যা। সে মায়ের কাছেই শুয়েছে চিরদিন।

সেই সময় দেখতে পায়, দিদি ওঘরে বিছানার পাশে আলোতে কোন দিন কি পড়ছে, কোন দিন চুপচাপ জানালায় ব'সে কি ভাবছে।

নলিন এসে একদিন কাঁধের ওপর ধাক্কা দিয়ে বলে, স্বপন দেখছ বুঝি ?

দিদি সচকিত হয়ে ওঠে, তারপর মৃদু হেসে বলে, শুলি নি ?

সে দিদির বিছানার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে বলে, ভাই, একটু মাথাটা টিপে দেবে ?

নলিনের জননীর মাতৃস্নেহচ্ছায়ে যে বেদনা অন্তরের একান্ত নীড়ে ঘুমন্ত ছিল, এখন দিনের কাজের আড়ালে, রাত্রির অবসরে, নিঃসঙ্গ জীবন-পথের নিরুদ্দেশযাত্রিণীর চোখে আপনার উষর অয়নচক্র স্পষ্ট হয়ে উঠে।

আজ কোন্ টিম হেরেছে, কে জিতেছে, ম্যাচটা জুত হ'ল না, তুমি যেন কি হচ্ছ, কেবলি হুঁ হুঁ করছ—নলিনের অনর্গল বক্তৃতা চলে দিদির বিছানায় শুয়ে। দিদি তার মাথাটায় হাত রেখে স্মিত মুখে শুনতে থাকে।

নলিন আপনার ক্রীড়ালোকের ছায়াচিত্র মনের মধ্যে দেখতে ব্যস্ত থাকে।

একটি একটি ক'রে দীর্ঘ মন্থর মূক অসংলগ্ন চিন্তাক্লিষ্ট রাত্রি, আর এক নিয়মের এক চাকায় কর্ম্মক্লিষ্ট দিন কাটে।

সর্ব্বমঙ্গলা সেলাই জড় করে, কাজ জড় করে, মনের চারদিকে বেড়া দেয়, তবু উদ্দেশহীন আকাশ, নিরুদ্দেশ বাতাস, সংখ্যাহীন নক্ষত্র, সীমাহীন অরণ্য প্রান্তর [illegible]াকে কোন্ দিগন্তের প্রান্তে নিয়ে যেতে চায়। চোদ্দ পনরো বছর বয়সের কয়েকটা দিন কোনখান থেকে এসে উঁকি-ঝুঁকি মেরে যায় সেইখানে।

চিরদিনের ভীরু নিঃসঙ্গ অন্তরের নারী তাও ভাবতে ভয় পায়। যে জল চোখে আসে, তাও সে ঝরতে দেয় না।

সর্ব্বমঙ্গলার বয়স চব্বিশ শেষ ক'রে পঁচিশের কোঠায় পা দিলে। নলিন কুড়িতে এসে পৌছল প্রায়। তার চুলের টিকি দিদির চোখে আর পড়ে না।

সেদিনের সেই সুন্দর বালক এখন বড় হয়ে গেছে এত—তার দিদি আর নাগাল পায় না, ভরসা পায় না। সভয় সবিস্ময় সঙ্গোপন সগৌরব স্নেহে সে বড়-হওয়া নলিনের দিকে চায়। নলিনের জননী থাকলে—তার পিসীমা থাকলে, সে হয়তো সঙ্কোচ অত করত না।

নলিন দিদির সঙ্গে কথা হয়তো সপ্তাহে একদিন কয়, বাপ, মেয়েদের কি শখ! এত সেলাই করতেও পারে! দিদি, চোখটি কানা হয়ে যাবে।

দিদির মুখে যে হাসি ফোটে, তার অর্থ সে নিজেই জানে না।

নলিন আবার বলে, কি হয় ও ক'রে? তোমার মতন আমাকে করতে হ'লে ক্ষেপে যেতুম।

যে দিদির নলিনের সঙ্গে সখ্য ছিল, সে দিদি আর নেই, এ দিদির কখনও বা চোখে জল আসে, কখনও অধরে হাসির আকারে একটা কি অদ্ভুত অব্যক্ত রেখা ফুটে ওঠে।

নলিন চ'লে যায়।

দিদি রাত্রের কাজ গোছায়। তারপর ভাবতে বসে—আকাশ পাতাল দুনিয়া দরিয়া—সাত পৃথিবী।

নলিন যদি নিজের ভাই হ'ত? ওর [illegible]তা জোর থাকত। কি করত? তা বলা যায় না। সর্ব্বমঙ্গলা জানে [illegible] নিজের ভাই কি রকম হতে পারত, শুধু ভাবে।

মূক স্নেহ, সভয় যত্ন, সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করার মাঝ থেকে দিদি একদিন হঠাৎ বললে, নলি, তুই বিয়ে কর না ভাই ?

পাগল !—উচ্চহাস্যে নলিন দিদিকে থামিয়ে দিলে।

ক্ষুব্ধভাবে দিদি বললে, এতে পাগলের কি আছে ?

নলিন হেসে বেরিয়ে যায়।

সর্ব্বমঙ্গলার বোধ হয় মনে হয়, একটি বধূ, তার ছেলেমেয়ে, তাদের কাজ হয়তো তাকে জীবনের মধ্যে নিয়ে যাবে, আস্বাদহীন দিবস-রাত্রির চাকা আর ঘোরানো কত যায় ! আহা ! আজ যদি ওর মা থাকতেন, তা হ'লে কি নলিনকে এত সঙ্কোচ ক'রে বলত, না চলত ?

দিদি আরও স্তব্ধ নীরব হয়ে এল। কাজ যেন কলে হয়, এক নিয়মের ছাড়া নেই, বাঁধা সব। বছরের পর বছর কেটে, আরও তিন চার বছর গেল।

বিয়ের কথা আর দিদি বলে না। নলিনের সময়ও হয় না দুবেলা আহারের সময় ছাড়া।

হঠাৎ একদিন নলিন বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে এসে দাঁড়াল। দিদির আশ্চর্য্যের যেমন শেষ রইল না, আনন্দের তেমনই অবধি রইল না।

বধূকে ক্রীড়নকের মতন পেলে যেন। যেদিন প্রথম এসেছিল পিতৃষ্বসার কাছে, সেদিনের কথা মনে প'ড়ে গেল তার, তেমনই যেন সহজ সব।

চুল বাঁধা, কথা কওয়া, রান্না করা, ঘরকন্নার সবখানেই যেন একটা নতুন আস্বাদ—প্রাণের সৃষ্টি হ'ল।

সর্ব্বমঙ্গলার কাজ, আরও বাড়ল, কিন্তু আনন্দের সন্তুষ্টির সীমা নেই যেন।

নলিন আর বড় বেরোয় না, অবসর তার বাড়িতেই কাটে।

কিন্তু নতুন উৎসাহের বেগ কখন যেন ক'মে গেল; তখন চোখে পড়ল আপনাকে, আর ওদের দুজনকে। আপনার শ্রান্ত অবসাদকে শত কাজের আড়ালেও চাপা দেওয়া যায় না। যে পরের প্রাণ আর আস্বাদ নিয়ে সে ভেবেছিল, আপনার শ্রান্তি মোচন করা যাবে, এখন অকস্মাৎ দেখা গেল, সেই ওদের দুজনের মাঝখানে—সংসারের মাঝখানে ওর তো প্রয়োজন নেই। হয়তো স্থান আছে; কিন্তু দরকার? তা যেন নেই। স্বাদ হয়তো আছে; কিন্তু নন্দিত কি? বেদনাময় শ্রান্ত মন অলস শিথিল অসংলগ্ন কল্পনায় ডুবে থাকে।

যত্ন বধূ তার স্বামীকে করতে পারে; গৃহকর্ম্ম এখন বধূর আপনারই যেন; কাজ সে করে ভাল, না করে, অসম্পন্ন থাকে না। বধূ নিজের স্বপ্নলোকের মাঝে নেবে কাজ ক'রে আপনার কক্ষে ফিরে যায়। অবসর দুজনের অতিবাহিত হয় দু রকমে; একজন স্বপ্ন দেখে আনন্দের আশার; অন্যে জীবনের সীমা খুঁজে পায় না, শেষ কোন্ দিকে—ধ্যান করে।

সর্ব্বমঙ্গলা আরও যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

পাড়ার মেয়েরা মাঝে মাঝে বধূর কাছে আসে।

সর্ব্বমঙ্গলাও মাঝে মাঝে ওদের কাছে বসে।

একজন একদিন বললে, তার দিদিমারা সব কোথায় তীর্থ করতে যাবে—চার ধাম ক'রে আসবে।

চার ধামের কোন সোজা স্পষ্ট অর্থ সর্ব্বমঙ্গলা জানে না; কিন্তু তার জটিল ব্যাকুল ভাবনা যেন একটা খেই খুঁজে পেলে। রাত্রে নলিনের আহারের সময় সে বললে, নলি, সুধাদের বাড়ির কারা সব তীর্থ করতে যাচ্ছে, আমাকে যদি পাঠিয়ে দিস, যাই।

নলিন মুখ তুলে চাইলে, স্বল্পভাষিণী সর্ব্বমঙ্গলাকে আজ কত বছর পরে চোখে পড়ল। চোখের কোলের ছায়ায় শ্রাবণের আকাশের সজল আভাস, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখশ্রী, মুখের সব হাড় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, মুখের কোনখানে সেই পনরো বছর বয়সের দেখা—জননীর সময়ের দেখা দিদিকে আর দেখা গেল না।

নলিন চোখ নাবিয়ে নিলে। রিক্ততা কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে পারে? শৈশব থেকে কত দিন স্বপ্নের মতন নলিনের চোখের ওপর ভেসে যেতে লাগল। আপনার পরিপূর্ণ জীবনের আনন্দের যাত্রার সঙ্গে সংসার কতখানি চলেছে, সকলে সহযাত্রী হতে পেরেছে কি না, যেন হঠাৎ সেটা তার মনে পড়িয়ে দিলে—কতদিন সে ওর সঙ্গে কথাও কয় নি, কোন খোঁজও রাখে নি। জননীর সময়ের কথা মনে পড়ল।

মুখে যে গ্রাস ছিল, তা যেন বিস্বাদ হয়ে উঠল; আস্তে আস্তে সে খাবার নাড়াচাড়া করতে লাগল।

দিদি শুষ্ক ভীত হয়ে ওর পানে চেয়ে ছিল, এমন ভরসা তার নেই যে জিজ্ঞাসা করে আবার।

আর নিবি কিছু?—একবার জিজ্ঞাসা করলে।

না। তা চাটুজ্জে মশাইরা কোথায় কোথায় যাবেন?—ভাই জিজ্ঞাসা করলে।

কি চার ধাম ক'রে আসবেন?

সে কি? সে তো অনেক হবে বোধ হয়, পারবে কি তুমি?—করুণাস্নিগ্ধ চোখে সে দিদির পানে চাইলে। কত খরচ পড়বে?

দিদি মাথা নীচু ক'রে পান সাজছিল, খরচের কথায় বললে, সে আমি আমার গয়না থেকে [illegible]ব 'খন ভাই। আর পারব নাই বা কেন?

ভাই একটু হাসলে, বললে, আহা, খরচের কথা তোমায় ভাবতে হবে না ; কিন্তু পারবে ব'লে সন্দেহ হচ্ছে। যেয়ো।

শুধু মনে হ'ল, নিজের চেয়ে তো মাত্র পাঁচ ছ বছরেরই বড় ; কিন্তু এত ক্ষীণ শীর্ণ ক্লান্ত কেমন ক'রে কখন হয়ে গেছেন! মা নেই, মাকে মনে প'ড়ে তাঁর ওপরই রাগ হতে লাগল।

উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম—সব দিকের বড় তীর্থ, দুর্গম সুগম সব না সারা হ'লে তীর্থই হয় না।

চট্টোপাধ্যায় মশাইয়ের মা বললেন, বাছা, এখন কি আর দুষ্কর কিছু আছে! সব রেল হয়েছে। সব যেতে হয়, করতে হয় ; তা বেশ করেছ, করবে বইকি। তা পিসতুতো ভাই হ'লে কি হয়, খাসা ছেলে, ইত্যাদি।

সহযাত্রিণীরা প্রায় এক রেজিমেণ্ট বিশেষ। বন্ধু, সখী, সই, আত্মীয়া—প্রায় সব বিধবা, দু একজন সধবা বন্ধ্যা, একটি একগুঁয়ে মেয়ে শুধু তার ছেলে নিয়ে দলভুক্ত হয়েছিল—গৃ।হণীর বোনঝি সম্পর্কে। তার শাশুড়ীও চলেছেন।

সর্ব্বমঙ্গলার অত সঙ্গিনী ও দলের সঙ্গে মেশা এই প্রথম। তার ভাব হ'ল সেই মেয়েটির সঙ্গে। সে শুধু এক পাশ হয়ে সেই শিশুটিকে নিয়ে থাকত।

ছেলেকে সর্ব্বমঙ্গলার কাছে দিয়ে সে বেঁচে যেত।

উত্তরে বদরিকাশ্রম কেদারনাথ, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, নীলাচল, দ্বারকা, গয়া, কাশী, কামাখ্যা, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ্যারণ্য ইত্যাদি সমস্ত ভারতবর্ষ, যে পথে যে রকমে হোক, পরিক্রম কর[illegible]বে।

অনুমতিপ্রাপ্ত সঙ্গপ্রাপ্ত কৃতার্থ সর্ব্বমঙ্গলা যন্ত্রের মত আপনাকে টেনে নিয়ে বেড়ায়; মনে ভাবনারও অবসর নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই। তাতে উল্লাস নেই, আশা নেই, একটি উৎকট শ্রান্তিই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়; আপনাকে নিয়ে শ্রান্ত সে সর্ব্বত্রই, আপনাকে অতিক্রম ক'রে যাতে যেতে পারে, নিজের অজ্ঞাতেই সেই চেষ্টা করে যেন।

শুধু খোকাটিকে কোলে নিয়ে তার শান্ত মূক মনের দীঘির কোণে উচ্ছল হয়ে বেদনার তরঙ্গ জেগে উঠতে চায়। মনে হয়, নলির যদি একটি খোকা হয়, তা হ'লে হয়তো সে বাড়িতে গিয়ে বেশ কাজ পায়, বেশ কাটে।

বন্ধ্যা দুটি নারী মাঝে মাঝে ছেলেটিকে কোলে নেন, ওদের সঙ্গে তাঁদের বাড়ির অপরের শিশুসন্তানের গল্প করেন। শিশুটিকে কোলে নিয়ে কোন দিন সুর ক'রে বলতে শোনে তাঁদের একজনকে—ছেলেবেলায় সেও কবে শুনেছিল, না পড়েছিল—

নতুন গাছে ফলবে বেগুন, পড়বে ঝিঙের জালি,
গোপাল আমায় 'মা' বলবে, ঘুচবে মনের কালি।

স্পন্দিত উৎসুক হৃদয়ে সে ছেলে-ভুলোনো ছড়া শোনে। সকলেই তো শিশুটিকে নানা রকমে সোহাগ করে, আদর করে। শিশুটির নতুন শেখা অস্পষ্ট অপূর্ব্ব ভাষণ বিধবা, সধবা, বন্ধ্যা, পুত্রবতী সকলেরই অন্তরে অত্যন্ত কৌতুকের আনন্দের সঞ্চার করে; কথার উপাদান সংগ্রহ ক'রে সকলেরই রাত্রের শ্রান্ত অবসর, দিনের স্বল্প অবসরকালও তাকেই কোলে নিয়ে কাটে; তার অস্পষ্ট মধুর কাকলির অনুকরণ করার শেষ তার তরুণী জননীরও যেমন নেই, অন্যেরও তেমনই নেই।

শুধু সর্ব্বমঙ্গলা পারে না। সে শুধু শিশুটিকে কোলে নেয় যখন অন্যে ব্যস্ত থাকে। ব্যাকুল লজ্জায় তার মুখে কোন আদরের প্রকাশও

কোন দিন জাগে না। বন্ধ্যা নারীটি তাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ান, সে শোনে তিনি সুর ক'রে কত ছড়া বলেন। অন্য প্রৌঢ়া বর্ষীয়সীরাও আপন আপন পৌত্র-দৌহিত্রের নানাবিধ অসাধারণত্বের পরিচয় দেন; স্তব্ধ মূক অনাথ অতীত, অনাথ অকূল ভবিষ্যচ্চারিণী সর্ব্বমঙ্গলা অপার বিস্ময়ের বেদনাময় আনন্দে শুধু সকলের কথা শোনে, তরুণী জননীটিকে দেখে।

মনের ভেতর গুঞ্জন জাগে—

নতুন গাছে বেগুন হবে, পড়বে ঝিঙের জালি,
গোপাল যখন 'মা' বলবে, ঘুচবে মনের কালি।

মুখে সে সুর ফোটে না। একটি কথা শুধু ফিরে ফিরে জাগে, শুধু 'ঘুচবে মনের কালি'। আবাল্য মাতৃহীন, স্বজনহীন সর্ব্বমঙ্গলা কারুকে মা ব'লে ডাকেও নি, মা-ডাক শোনবার অবসরও কোন শিশুর নিকট পায় নি।

তবু নলিনের সন্তান, হয়তো ছোট্ট একটি ছেলে—তার কাজ—

চার ধাম তীর্থ অকস্মাৎ একদিন সারা হয়ে গেল। নানা দুর্গম সুগম সরল বক্র পথের যাত্রী, যারা একত্রে ছ সাত মাস কাটিয়েছিল পার্ব্বত্য পথের চটিতে চটিতে, গুহায়, ছায়ায়, ধর্ম্মশালায়, সরাইয়ে—স্বজনের মতন, সকলের যাত্রা সাঙ্গ হয়ে গেল।

জিনিস কেনবার, গোছাবার ধুমে দলটি ব্যস্ত হয়ে উঠল। সকলেই ভারী নিশ্চিন্ত। এতবড় তীর্থ এমন সুমঙ্গলে, সহজে, অল্পদিনে, সুসঙ্গে সারা হয়ে গেল, এ যে কার পুণ্য এবং কার ধর্ম্ম-বলে, বড়ই শক্ত বলা। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়িতে পৌঁছতে পারলে হোত পা ছড়িয়ে বাঁচা

যাবে। কার কি কিনতে হবে, কে কি ভুলে গেছে, কার কি চেয়েছে—ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী, এর হিসাব-নিকাশে দল মশগুল।

শুধু সর্ব্বমঙ্গলার মনে হয়, এরই মধ্যে সারা হয়ে গেল ?

চার ধাম এত শীঘ্র হয়ে যায় ? সেকালের মতন যদি জলপথে, হেঁটে, গরুর গাড়িতে যাওয়া হ'ত !

বাড়িতে গিয়ে কি হবে ? সর্ব্বমঙ্গলার খুব সূক্ষ্ম ক'রে ভাববার মত বুদ্ধি নেই, কিন্তু শ্রান্ত মন যেন তার কানে কানে সমস্তক্ষণ বলতে চায়, যতদিন না তার যাত্রা শেষ হয়, ততদিন এই তীর্থপরিক্রমা চলুক। কেদার, বদরী, কামাখ্যা, দ্বারকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দূর-দূরান্তর, দিগ্বিদিক—সোজা পথ নয়, সহজ নয়, অজানা জানা দুর্গম সুদূর যাত্রা ক্রমাগত চলুক না ! পায়ে হেঁটে অবিশ্রান্ত নিরবসর নিরুদ্দেশ অন্তহীন যাত্রা কোন একটি নিশ্চিন্ত সমাপ্তিতে পৌছে দিক ! ধরিত্রীর সমস্ত অরণ্য প্রান্তর নগর সাগর শৈল পরিক্রমণ ক'রে এলেও কি আরও বৎসর-ঋতু-মাসের অয়নচক্রে পরিভ্রমণ বাকি থেকে যায় ?

কিন্তু তীর্থযাত্রা সমাপ্ত হ'ল।

আরও ক্ষীণ জীর্ণশীর্ণ দেহমনের ভার নিয়ে সর্ব্বমঙ্গলা আপনাদের বাড়িতে এসে পৌছল।

নলিন এসে প্রণাম করলে, আনন্দিতও হ'ল। শরীরের অবস্থায় দুঃখিতও হ'ল, অনুযোগ করলে একটু।

বাড়ির শ্রী অন্য রকম। সর্ব্বমঙ্গলার যেন মনে হ'ল, সে অতিথি পথিক। যে বাড়িতে সে এতদিন কাটিয়েছে, এ সে বাড়ি নয়, এ যেন শ্রীতে, লক্ষ্মীশ্রীতে, নতুনত্বে অন্য রকম।

নলিনের বউ একটি দুমাসের শিশু কোলে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

সর্ব্বমঙ্গলা সবিস্ময় আনন্দে অবাক হয়ে চেয়ে রইল, নলি, আমাকে খবর দিস নি ?

শিশুকে কোলে নিয়ে যেন তার আনন্দের অবধি রইল না।

নলিন একটু হেসে বললে, কি ক'রে খবর দোব ? ছিলে কি কোন জানা জায়গায় ?

শ্রান্ত সর্ব্বমঙ্গলা এবারে কাজ খুঁজে পেলে, ভাবলে।

খোকাকে কোলে ক'রে থাকা, ঘুম পাড়ানো কখন কখন দুধ খাওয়ানো, স্নান করানো, এমনই ধারা কাজ দিয়ে নিজেকে ঘিরে নিতে চায়।

শ্যামবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট, দুধহাসিলালাময়-মুখ শিশু—তাকে নিয়ে সর্ব্বমঙ্গলারও কাজের ভাবনার শেষ নেই, তার জননীরও অবসর নেই। সর্ব্বমঙ্গলার মনে পড়ে তার পিতৃষ্বসাকে, চোখ জলে ভ'রে আসে, নলির ছেলে !

ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় এসে পড়ল।

শিশুর মাতামহী এলেন দেখা করতে। দিন সাত আটের জন্যে সর্ব্বমঙ্গলার কাজ বাড়ল, কিন্তু খোকাকে সে ছাড়তে পারে না।

ছেলেকে নিলে কাজে ফাঁক প'ড়ে যায়।

দুদিন গেল। জননী বললেন তনয়াকে, হ্যাঁরে, খোকাকে নিয়ে ওঁর অত বাড়াবাড়ি কেন ? কাজ তো সবই প'ড়ে থাকে ! এত কিসের ? সম্পর্কটি তো ভারী—নিজের বোনও তো নয়।

উনি খোকাকে খুব ভালবাসেন, মা।—মেয়ে মৃদুস্বরে বললে।

সর্ব্বমঙ্গলা পাশের ঘরে বোধ হয়।

ভালবাসা! তুই নেকা, কাজ না করবার ফন্দি বুঝিস না? দিদি—দিদি!

মেয়ে বললে, মা, পাশের ঘরে আছেন, শুনতে পাবেন।

শুনুক, তুই আর খোকাকে দিস নি। ব'সে থাকা দেখছি!

সর্ব্বমঙ্গলা সত্যই পাশের ঘরে ছিল, আর কথাগুলো না শোনবার মত ক'রে বলাও হয় নি।

নিজের তার বেদনা ছিল, অভাব ছিল, দুঃখ ছিল, কিন্তু বাইরের অবমাননা ছিল না।

তার সমস্ত অন্তরাত্মা, সমস্ত স্নেহ মমতা এক মুহূর্ত্তে যেন বরফের মত জমাট হয়ে গেল। ওরা সব মিথ্যে ভাবে, কুড়েমি ভাবে।

সর্ব্বমঙ্গলা আবার কর্ম্মচক্র ঠেলে।

কিন্তু কাজ করলে শেষ হয়ে যায়। বিরাম বিশ্রাম নিরবচ্ছিন্ন অসহ্য। আবার তেমনই গরুর গাড়ির মতন স্থূল অস্তিত্বের মোটা বস্তা ব'য়ে নিয়ে তার দিবারাত্রির চক্র করুণ ক্লান্ত আর্ত্তনাদ ক'রে ঘুরতে ঘুরতে যেন পৃথিবীর প্রান্ত—গন্তব্য সীমান্ত খুঁজে বেড়ায়। জানলায় ব'সে রাত্রির নিদ্রাহীন প্রহরগুলি কখন সাঙ্গ হয়ে যায়।

মনে হয়, এই গোলোকধাম পার হবার পারানির কড়ি কি বিধাতা তাকে দেন নি? নলিনকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে যায়, ভাই, কোথাও পাঠিয়ে দিবি? কিন্তু নলিনকে তার সঙ্কোচ হয় কিছু বলতে।

পূজোর ছুটি এল। চাটুজ্জে-গৃহিণীরা আবার কোথায় কোথায় যাবেন; ফিরে এসে কাশীতে ছ মাস থাকবেন।

সর্ব্বমঙ্গলা নলিনকে বললে সাহসে ভর ক'রে। নলিন দিদিকে নিষেধ করলে না; শুধু স্ত্রীকে বললে, দিদির কি রকম শরীর হয়েছে

দেখেছ? স্ত্রী অপ্রস্তুতভাবে বললে, হ্যাঁ, উনি বড় অনিয়ম করেন—অসময়ে স্নান, অনাহার।

তুমি একটু দেখ না? আর অত কাজই বা করেন কেন? বেশ তো খোকাকে নিয়ে থাকতেন।

স্ত্রী চুপ ক'রে গেল। অসহায় শান্ত দীন স্তব্ধ সর্ব্বমঙ্গলার ওপর কোন দিনই তার বিদ্বেষ ছিল না, বিরাগও ছিল না। কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলা আর খোকার বাহুবন্ধনে ধরা দেয় না।

ওমা! সারা পথ গিয়ে বলে কিনা 'খেয়াঘাটে গড়াগড়ি'—তাই হ'ল? ওমা, কে দেখে এখন?

কি রে, কি? কার কথা?

ওগো, ওই সর্ব্বমঙ্গলার কথা গো। সব পথ গিয়ে কিনা এই কাশীতে এসে জ্বরে পড়ল গা!

চোখ আর চাইতে পারছে না গো, মা!

এমনই নানাবিধ মন্তব্য কথা হতে লাগল কাশীতে পৌঁছে। ভ্রমণ-চক্র শেষ ক'রে কাশীতে থাকবার সময় যখন এল, তখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল।

তা ভাইকে 'তার' ক'রে দাও, তাদের দেখাশোনা করা উচিত তো, নইলে তোমাকেই দুষবে।

যে দশা হয়েছে, বাঁচে কি না—

সকলেই ভীত হয়ে উঠল; বাড়ি পৌঁছবার উদ্দেশে এ কি অলক্ষণ!

সর্ব্বমঙ্গলা দ্বিতীয় বারের যাত্রাশেষে কাশীতে পৌঁছে শয্যা নিলে। সঙ্গীরা সকলে ত্রস্ত হয়ে উঠল।

ভাইয়ের কাছে খবর গেল, অনুতপ্ত ভাই ভাজ দুজনেই এল।

দিদি !—নত হয়ে মাথায় হাত দিয়ে নলিন ডাকলে।

দিদি চোখ খুলে পরম স্নেহে ভাইয়ের মাথায় হাত রাখলে। মৃত্যু-পথবর্ত্তিনী যেন অনাগত প্রৌঢ়ত্বও অতিক্রম ক'রে গেছে। আর নলিনকে লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই। খোকাকে দেখে হাত বাড়িয়ে বললে, নলি, তোর খোকাকেও নেবার ক্ষমতা আর নেই। চোখে দু ফোঁটা জল এল। বধূ খানিকটা বুঝলে যেন, কিন্তু নলিনের কিছুই জানা ছিল না।

ভাই ভাজ পাশে এসে ব'সে থাকে শিশুটিকে নিয়ে।

সর্ব্বমঙ্গলা এক একবার চায়, যেমন চোখ বোজে, তার যাত্রা স্বরু হয় হিমালয়ের চটিতে চটিতে, পথে পথে, নীলাচলের সাগরের কূলে কূলে। ভাই, এরই মধ্যে হয়ে গেল ? আরও যেতে হবে ? আর কতদূর দিদি ?

এমনই অসংলগ্ন প্রশ্ন ক'রে ভাজের পানে চায়।

ভাই জিজ্ঞাসা করে, কি ?

সে সামলে নেয়, জবাব দেয়, কিছু না তো।

দিন দুই পরে অনেক রাত্রে সে ভাইকে পাশে ব'সে থাকতে দেখে ডেকে বললে, ভাই, ও অনেক খরচ, তুই সব করিস নি।

কিসের খরচ দিদি ? ডাক্তারের ? তোমায় ভাবতে হবে না।

না, ডাক্তার নয়—ওই চার ধামের। দেখ না, এই যে, অনেক দূর। জানালার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললে, ওই যে সবুজ বন, নদীটি পার হয়ে আরও কতদূর যেতে হবে, তবে সেখানে পৌছব।

কোথায় দিদি ?

ভাইয়ের কথায় উত্তর না দিয়ে সর্ব্বমঙ্গলা বলতে লাগল, ঐ যে

যেখানটিতে আকাশ ঠেকে আছে, অতদূর—অতদূর পৃথিবীটি পার হয়ে সেইখানে কিনা সেই মানস সরোবর ; বড় শক্ত—

ভাই একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, দিদি, ঘুমোও একটু।

হ্যাঁ, এই যে শুই। সর্ব্বমঙ্গলা একটু চুপ ক'রে আবার বলে, আপনি বললেন মাসীমা, এ সহজ পথ, দুষ্কর নয় ; কিন্তু ও যে অনেকখানি !

ভোরের বেলা বধূ উঠে জিজ্ঞাসা করলে, ঘুমিয়েছিলেন ?

স্বামী উত্তর দিলে, না।

সর্ব্বমঙ্গলা একমনে আপনার গন্তব্য পথের মানচিত্র মুখস্থ করছে।

ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন, দেখলেন, বললেন, একটু ঘুমের দরকার, আরাম পেতেন। ওষুধ আর কি দোব ?

লেডিস ক্লাব

লেডিস ক্লাব, ওরফে মহিলামণ্ডল। সুভূষিতা দিশী, স্বল্পভূষিতা বিলিতী, চুড়িদার, পেশোয়াজ, কাবলীওয়ালার পাজামা পাঞ্জাবি, ঘাগরা ওড়না শাড়ি ইত্যাদি পরিবৃতা সালঙ্কারা সর্ব্বজাতিক নারীমণ্ডল। উদ্দেশ্য মহৎ। কেউ বলেন, আত্মোন্নতি; কেউ স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারিণী সভা, কেউ সম্মিলনী ব'লে থাকেন।

বীণার দিদি বললেন, কিছু নয় রে ভাই, খালি সময় কাটানো, চল না গিয়ে দেখবি।

স্ত্রীকে বাধা দিয়ে বীণার ভগ্নীপতি বললেন, না রে বীণা, এই গয়না-কাপড়গুলো প'রে সেজে-গুজে সভ্যভাবে পরচর্চ্চা করা। ও তো মহিলামণ্ডল নয়, মহিলা-গণ্ডগোল।

দিদি রেগে গেলেন, থাম মশাই, নিজেদের যেন পরচর্চ্চা করা হয় না! আর আপনাদের এক একটা সুটে এক একটা গয়নার ধাক্কা যায় না বুঝি? ওঁর কথা শুনিস তো শোন, নইলে যাবি তো চল।

বীণা অপ্রস্তুত হয়ে হাসে, জামাইবাবু, আপনি বড় জ্বালাতন করেন। কিন্তু আমি থাকি না ভাই।

আহা, চল না। তোকে ফেলে আমি কি ক'রে যাই?

বীণা আরও অপ্রস্তুত হয়ে বললে, আমি যে কথাই কইতে পারি না, আর ছাই এ প'রে গেলে হবে তো?

জামাইবাবু ধমক খেয়ে ধূমপানে মন দিয়েছিলেন, এখন করুণ স্নেহে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হবে না কেন? তুই আমার শালখানা নে না, হবে 'খন।

দিদি সমর্থন ক'রে বললেন, যা শিগগির তা হ'লে, আয়।

জামাইবাবু বললেন, চল, আমি বেরুবার সময় তোমাদের নাবিয়ে দিয়ে যাব 'খন। নে তো বীণু শিগগির ক'রে, তোর দিদির এখন প্রসাধন করতেই দেখ না সাড়ে ছটা হয়ে যাবে। তুই এক কাজ কর, আমার রিস্টওয়াচটা আর তোর দিদির চটিটা প'রে নে।

যান, আবার আমার সঙ্গে লাগলেন!—বীণা হাসলে। দুদিনের জন্যে আসা, আঃ, দিদি আবার কি বিপদে ফেললে!

মস্ত বাগান। তমাল তালী নারিকেলের সার নেই, আছে শিমুল, পলাশ, নিম, বট, অশ্বত্থ, দেবদারু, শিশু, জাম, আম এমনই কত কি বনস্পতি-অবনস্পতির স্নিগ্ধ ছায়া; মাটিতে ঘাস, টবে মরশুমি ফুল।

স্ত্রীজাতীয়া মালী, ঘাস মাটি পরিষ্কার করতে, গাছে জল দিতে ব্যস্ত।

শতরঞ্চি পাতা, বেঞ্চি পাতা, দেশী বিলাতী দু রকম ব্যবস্থা।

বীণার দিদি পৌঁছলেন স্মিত হাস্যে।

নমস্তে মাতাজী; নমস্তে বহিনজী। ওমা, কেমন আছিস? দিদি যে! সেদিন তো আসেন নি! সেলাম, নমস্কার, প্রণাম ইত্যাকার নানাদেশী অভিবাদন সমাপ্ত হ'ল।

দিদি বসলেন বেঞ্চিতে, সুতরাং বীণুও তাই বসল। জনান্তিকে মৃদু ভাষণে দিদি বললেন, ওই যে পাজামা পরা, ও হচ্ছে ইসলাম—

নবাগতা গাছের আড়ালে পড়লেন।

পুরুষমানুষ? তুমি যে বললে মেয়েদের বাগান?

পুরুষ কেন? এখানকার ফয়েজ আলি খাঁ উকিলের মেয়ে।

দেখালেন, মাথায় ওড়না পরা একটি সুশ্রী বালিকা। নবাগতা সমবেত সকলকেই আদাবরজ ক'রে স্মিত হাস্যে আসন গ্রহণ করলেন।

কি নাম ভাই?

দিদি খুব মৃদুস্বরে বললেন, কি জানি, বুঝি একটা উন্নেসা আছে। ওই দেখ, ওই কমলকুঁয়র সুরযকুঁয়র চন্দ্রকান্তা প্রকাশরা এল।

ভাই, এ কি সবাই এমনই ধারা নামের? সবিস্ময়ে বীণা দেখছিল। সুন্দর কোমল শ্রীমতী সুন্দরী কয়েকটি বালিকা।

তিনজন মেম প্রবেশ করলেন।

হ্যালো মিসেস মুখার্জি; গুড ইভ্‌নিং মিসেস রামদয়াল; ইয়েস, কোয়াইট ওয়েল—ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ও নানাবিধ শিষ্টাচার চলতে লাগল।

দিদি বললেন, উনি হচ্ছেন এখানকার মণ্ডলের সেক্রেটারি মিস ক্লেয়ার।

তিনি এসে পড়লেন দিদির কাছে; মধুর কৃত্রিম হাস্যে ইংরেজীতে দিদিকে বললেন, হ্যালো, তুমি আসিয়াছ।

দিদির ইংরেজী প্রায় না জানাই, মিস ক্লেয়ার শুধরে নিয়ে তারপর হিন্দীতে বললেন, টুম আয়া—বড়া খুশিকা বাট।

দিদি বললেন, আপকি বড়ি মেহেরবানি।

দিদি বাঁধা গৎ গুটিকতক ইংরেজীমিশ্র হিন্দীতে কোনক্রমে ব'লে দিতেন। ইংরেজীমিশ্রিত হিন্দী আর অবিশুদ্ধ হিন্দী, তাতেই 'সীতা নাড়ে হাত, আর নাড়ে মাথা' ক'রে আলাপ-আলোচনা চলে।

দিদি নিজের ভগিনীর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন, মেরি বহিন।

ভারী আনন্দিত হলাম, বড় আনন্দের কথা তুমি এসেছ, বড়ি খুশিকি বাট।

দিদি টিপে দিলেন, বল না—আমিও খুব আনন্দিত হলাম।

বীণা গম্ভীর অপ্রস্তুত মুখে ঘেমে কনে-দেখার মতন অপ্রতিভ হয়ে রইল, ও হিন্দীও জানে না।

দিদি বললেন, ও ভেরী শাই মেম সাহেব, ওরও খুব ভাল লেগেছে।

মিস ক্লেয়ারের পঁচিশ বৎসর এদেশে কেটেছে, দিশী ধরন-ধারন তাঁর আয়ত্ত হয়ে গেছে, এবারে তিনি অকৃত্রিম হাস্তে 'ইয়েস, ইয়েস' বলতে বলতে অন্যত্র গমন করলেন।

দিদি বললেন, মাগো, তুই কি সং, একটা কথাও কইবি না?

পাশের একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপকি বহিন?

দিদি বললেন, জী হাঁ।

মিস মেরী ইন্দ্র, মিস মিনি লাল প্রবেশ করলেন—বালিকা-বিদ্যালয়ের দেশী খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রী।

আগমনীর পালা সাঙ্গ হয়ে এল প্রায়, ওদিকে ব্যাড্‌মিণ্টন, ক্রোকে খেলা আরম্ভ হ'ল।

বয়ঃকনিষ্ঠারা—পালকের বলের সঙ্গে যাঁরা উড্ডীয়মান হতে পারেন, তাঁরা গেলেন সেই খেলায়; পরিণতবয়স্কারা গেলেন কাঠের লম্বা হাতুড়ি দিয়ে ভারী ভারী কাঠের বল ঠেলতে ক্রোকের ক্ষেত্রে।

তার চেয়ে স্থবিররা আর অনিচ্ছুকরা ব'সে ব'সে গল্পই করতে লাগলেন।

মিস ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, মিসেস মুখার্জি, যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি, এই বালিকাটি কেন সাদা পরা?

সাভরণা দিদি এবং নিরাভরণা বীণা সমান রাঙা হয়ে উঠলেন, ব্যাকুলভাবে দিদি বললেন, উসকা পতি নেহি হায়।

পার্শী, মুসলমানী, পশোয়ারী, সব উৎকর্ণ আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইল।

মিস ইন্দ্র বললেন, তা ইনি সাদাই পরবেন?

দিদি বললেন, জী হাঁ, আমাদের এইসি রীত হ্যায়।

জনান্তিকে পার্শ্ববর্ত্তিনী একজনকে পেশোয়ারী বললেন, ইয়ে ক্যা গজব! (একি অদ্ভুত!)

মুসলমানী বললেন, বাঃ, ইয়ে হিন্দুওঁকী রীতেঁ এইসি ভাই। মেরে ঘরকে পাশ এক থি, পটনেমে যব থে।

মিস মিনি লাল প্রকাশ্যেই বললেন, আরে, এইসি রেওয়াজ এঁ হ্যায়। আমি যখন বাল্যকালে হিন্দু ছিলাম, আমার মনে আছে, খানাপিনা তক সব বাতোঁ মে জুদা।—করুণ নেত্রে তিনি বীণার পানে চাইলেন।

মিস ক্লেয়ার এসে পড়লেন খেলার সঙ্গী সংগ্রহ করতে। কথার ব্যক্তিগত প্রবাহ সংযত হয়ে গেল।

বীণা বললে, চল ভাই।

দিদি উঠতে যান। মিস্ লাল বললেন, বহিনজী, কিছু মনে না করেন তো বলি, ঈশার আশ্রয় কত উদার!

মেম বললেন, কিসের কথা? সমাজের? সত্য কথা। পুওর গার্ল! তা আপনারাও তো এখন আবার বিবাহ দেন?

বীণার অপ্রস্তুতের সীমা ছিল না, রাম রাম, দিদি, চল না!

দিদি হিমসিম খেয়ে বললেন, নেহি, আমাদের জাতে ইয়ে রীত পছন্দ নেহি।

সেলাম, নমস্তে, আদাবরজ ক'রে বিদায় নেওয়া হ'ল।

মুসলমানী পেশোয়ারীকে বললেন, বিচারীকে ক্যা তক্‌লিফ!

মেম করুণ হাস্যে মিস ইন্দ্র আর মিস লালের দিকে চাইলেন, মিস লালরা খুব গর্ব্বিত হয়ে উঠলেন।

হিন্দুরা কিছুই বললেন না।

কি রে, কেমন দেখলি ?—জামাইবাবু প্রশ্ন করলেন।

রাম রাম! আবার বলে, এদের কি দুঃখ! ছাই জামাইবাবু।

বীণার তখনও অস্বস্তি যায় নি।

জামাইবাবু জিজ্ঞাসু নেত্রে দিদির দিকে চাইলেন, তোমার বোন বলে কি ?

দিদি কোলের খোকা আর নিজের অর্দ্ধপরিত্যক্ত বেশভূষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, ব'ল না। যা হাড় জ্বালিয়েছে আজ সবাই মিলে। বীণুর কেন সাদা কাপড়—যা তা!

তাই বুঝি শুধু? আবার বলে, আমাদের ধর্ম্ম কেমন ভাল।—বীণা অপ্রস্তুতভাবে বললে।

জামাইবাবু সবিস্ময়ে বললেন, কে রে, কে বললে, মিস ক্লেয়ার?

না গো, ওই সব মিস ঈশামুসা।—দিদি বললেন।

ওরা তো বলবেই। তাই বল। তা তোর ভাল লাগল না?

না, কি সব কথা কয়, না ছিরি না ছাঁদ, সুখী হলুম, সুখী হলুম, বড্ড ভাল, কি মিষ্টি—

জামাইবাবু পুলকিত হয়ে অট্টহাস্যে বললেন, ঠিক বলেছিস, ওই রকমই আরম্ভ। কিন্তু তোর দিদির—হ্যাগা, তোমার তো খুব ভাল লাগে, না?

তা মন্দ তো নয়, আজকেই কেমন বীণুকে ওই ওরা কটা পেয়ে বসেছিল, অন্য দিন তো কথাবার্ত্তা মন্দ হয় না।

দেখলি, ওঁর ভাল লাগে। ওঁদের কিনা অন্য দিন গয়না-কাপড়ের চর্চ্চা আর সব ভাল ভাল কথা হয় কিনা!

হ্যাঁ। আয় রে বীণা।—দিদি সভ্রূভঙ্গে খোকাকে নিয়ে পাশের ঘরে উঠে গেলেন।

আর এক সন্ধ্যা।

বেস্পতিবার।

দিদি বললেন, ওগো, আমাদের আজ মাসিক অধিবেশন, অন্য সপ্তাহে না গেলেও চলে, আজকে চাঁদা দিতে হবে, আবার সব কি নিয়ম আছে—উপস্থিত থাকতে হবে। নাবিয়ে দিয়ে যেও।

হরি হরি! তোমাদের নাবানো মানে ছটা থেকে কেবল ঘড়ি দেখা আর তাড়া দেওয়া।

অপ্রিয় সত্য শুনলে কার না রাগ হয়, সত্য হ'লেই বা! কোলে ছিল খোকা সায়াহ্ন-প্রসাধনের প্রয়োজনে। দিদি খোকার মুখখানা সজোরে মুছিয়ে দিলেন, কি অপরিষ্কার ক'রে যে রাখে! খোকা কিন্তু সেটা নীরবে সহ্য করলে না।

উপক্রমটা উপসংহারে কি দাঁড়াতে পারে ভেবে জামাইবাবু শঙ্কিত-ভাবে চুরুটটা নাবিয়ে বললেন, তা তোমাকে আগে দিয়ে আসুক না? এই কিষণ, হরদয়ালকো বোলো মোটর নিকালনে।

সেটা কি ভাগাড়, না স্টেশন যে আগে থাকতে গিয়ে প'ড়ে থাকব? দিদির ঘড়ির দিকে আপনিই দৃষ্টি পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে জামাইবাবুরও আপনিই সেদিকে নজর পড়ল। দেখলেন, সাড়ে পাঁচটা। কিন্তু ভাগাড়ের সঙ্গে স্টেশনের, আর দিদির সঙ্গে তাদের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে—মনে হ'ল, কিন্তু সেটা আলোচনার সময় নয়, সুতরাং—

তা হ'লে নয় আমাকে পৌঁছে এসে তোমায় নিয়ে যাবে? এই কিষণ, মানা করো, থোড়া পিছে।

অতখানি যাবে আসবে, তার চেয়ে নাবিয়ে দেওয়া বুঝি বড় কষ্ট? থাকগে, আর যাব না, এবারে ব'লে আসব।

দিদির মুখখানা উপক্রমণিকা আষাঢ়ের মত হয়ে এল।

ক্যালেণ্ডারে বৃহস্পতিবার চোখে পড়ল। ছাই ক্লাবও কি বেস্পতি-বারেই বসে! ঝগড়া হবে না তো কি?

জামাইবাবু অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

ও বীণু, যাবি নাকি? তা হ'লে তৈরি হয়ে নে।—শ্যালিকাকে আহ্বান ক'রে জামাইবাবু ব্যাপারটা সহজ ক'রে নিতে চাইলেন।

না বাবু, আবার? আমার ওসব ভয় করে। বীণা ঘরে ঢুকল, খোকাকে দেখে কোলে নিয়ে বললে, তার চেয়ে একে নিয়ে থাকা ঢের ভাল।

সকলেই উপস্থিত। বেশির ভাগই ব'সে আছেন। কেউ কেউ খেলছেন।

নতুন একজন সভ্য হলেন। পরিধানে খদ্দরের শাড়ি, মোটামুটি গহনা। মেম একজন বললেন অপরকে, দেখেছ, গান্ধি ক্লথ না?

অপরাও দেখলেন, বললেন, হ্যাঁ।

কি বিশ্রী মোটা!

অন্যকে স্বীকার করতে হ'ল।

মিস লাল মিস ইন্দ্র সব ছিলেন।

শুনেছেন, মহাত্মাজীকে কি রকম ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে?—একজন হিন্দুস্থানী বললেন।

একটি শিখ মহিলা উত্তরে বললেন, বড়ি আফসোসকি বাত!

ঔর শোলাপুরকা হাল?—তিনিই জিজ্ঞাসা করলেন।

পেশোয়ারী বললেন, সব বাতেঁ বিগড়ী হুয়ি হর দেশমে, পেশোওয়ার-মেভি। দেখিয়ে তো, সব বালবচ্চেঁ হুঁয়ে হ্যায়—

মিস লাল শুনছিলেন, চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। পর হোনা ক্যা ?

সকলের চোখ পড়ল তাঁর দিকে।

কিসের কি ? সবাই চেয়ে রইল।

এই যে হল্লা মচানা আর দেশে দেশে আগুন জ্বালানো—মানুষ সব সুখে স্বচ্ছন্দে ধনেপ্রাণে বেঁচে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে মৌজ ক'রে রয়েছে, তাদের ঐ নাচিয়ে দিয়ে কষ্ট পাওয়ানোটার ফায়দাটা কি ? এই এরা—আংরেজরা তোমাদের জন্যে কি না করেছে, রেল ষ্টীমার ডাক টেলিগ্রাফ মোটর ইত্যাদি—মিস্ লালের বক্তব্যের বিষয় ছিল এই।

দিদি আর ছু একটি বাঙালিনীর সঙ্গে 'ঘর-কোটালে' গল্পে মগ্ন ছিলেন, হঠাৎ শুনে চকিত হয়ে চাইলেন সেই দিকে। তাঁর মনে হ'ল, এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান।

উত্তর দিলেন শিখ মেয়েটি, কিন্তু এরা কিছু অন্যায় করছে না তো। মারাপিটি কেন সরকার এদের করেন ?

কিন্তু চিড়ায় কেন ? ঐ দেখ না খদ্দর পরা—কি হবে ? ও তো না হয় তোমাদের ছিল, এই যে মোটর, এরোপ্লেন, এর আরাম, এ কি পরদেশী আরাম নয় ? আজ যদি এরা রাগ ক'রে সব নিয়ে যায়, কি হবে তোমাদের ? ইয়ে লুন বনানা বেকায়দা ?

দিদির মনে হ'ল, ছয় মাসে উত্তরিব ছ দিনের পথ।

নেপালী মহিলাটি জনান্তিকে মুসলমান মহিলাকে বললেন, সব বালকরা মিলে এই সব করছে, এতে হিসাবী আদমী কেউ নেই।

মুসলমানী বললেন, বেশক, ঠিক আপকি বাত।

মিস ইন্দ্র চুপ ক'রেই ছিলেন এতক্ষণ সভার মধ্যে, এইবার তিনি বললেন, মগর শোচিয়েতো (ভেবেই দেখ), যদি এঁরা আজ তোমাদের কথামত চ'লেই যান, এঁদের আর কি—তোমাদের কি হবে ?

কোই বাতকি ফিকর কিসিকো করনে পড়তা? এইসি হি শোর মচানা! বোধ হয় মনে মনে সবাইকে বলতে হ'ল, না, দুশ্চিন্তা কারুর করতে হয় না।

মিস লাল বললেন, ঔর দেশ! দেশ! সওরাজ (স্বরাজ)! লেকে হোগা ক্যা?

কিন্তু সাহেব-মেমের সামনে রাজনীতি, গা-ছমছম করতে থাকে।

একজন উঠলেন, চলিয়ে, উধর সভা হো রহি।

ময়ূর-সিংহাসন

মোগল বাদশাদের তখ্‌ত-তাউসের কথা নয়, এবং জাহানারা রোশেনারা জেবউন্নিসা প্রমুখ শাহাজাদীদের কথাও নয়—যাঁরা বাদশার পর বাদশার রাজত্বে, একের পর একে, পিতার ময়ূর-সিংহাসনের পেছনে সাদা পাথরের জালায়নের ভেতরে ব'সে গৌরবান্বিত অস্তিত্বে, গর্ব্বিত অন্তরে, আমীর, ওমরাহ, শাজাদা, রাজা, মহারাজা বেষ্টিত পিতার সভা দেখতেন।–

এ হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত জমিদার নরনারায়ণ ভাতুড়ীদের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের কথা ও তাদের মেয়ে শিখার বিবাহের কথা। নরনারায়ণ ভাতুড়ীর প্রপিতামহ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আমলে কি করতেন বা কি ক'রে অত বড় জমিদারি অর্জ্জন করেছিলেন, সে কথা তাঁদের বংশের সবাই জানে, কিন্তু বলে না; এবং সেই ধনসম্পদ যে দেবী চৌধুরাণীর ভাষায় 'জপতপের নয়', সে কথা বলা বাহুল্য। তবে এখনকার দিনে অন্য লোকে সে কথা জানে না, অতএব সকলেই তাদের বনিয়াদী ধার্ম্মিক বংশ বলে।

সেকেলে ধরনের প্রকাণ্ড বাড়ি ও তারও চেয়ে বড় বাগান বরাহনগরে। বছরে গরম ও বর্ষার কমাস এখনও ওখানেই থাকা হয়। ওঁরা এখনও বালিগঞ্জীয় সভ্যতাকে পোষ্য গ্রহণ করেন নি। সেকেলে আভিজাত্য-গর্ব্ব অতিশয় রক্ষণশীলভাবে ওঁদের মনের ধমনীতে বয়। ওঁরা অপরের অনুকরণ করেন না, অপরে ওঁদের অনুকরণ করুক।

নরনারায়ণ ভাতুড়ী নেই। তাঁর ছেলে সুরনারায়ণ ও বীরনারায়ণ।

স্বরনারায়ণের মেয়ে শিখার বিয়ে উপলক্ষে এই সভা ও গায়ে-হলুদের ভোজে এই কন্যাসন সাজানো হয়েছে।

মেহগ্নি কাঠের অতি হাল্কা চৌকি—লতাপাতাফুল-আঁকা রূপার পাতে খানিক খানিক মোড়া ; চৌকির পায়া চারটি বাঘের থাবার অনুকরণে তৈরি, তাদের নখের কাজগুলি রূপালী ফিকে নীল মিনার। পেছনে ঠেস দেবার জায়গাটা খুব সোজা নয়, একটু হেলানো ; তার কাঠের কাজে সোনালী করা রূপার পাতের ফুল আর কাঠের কালো সূক্ষ্ম পাতায় মনে হয় যেন অপূর্ব্ব। আসলে একখানি চৌকিই, একটু জমকালো রকমের কাজ করা। কিন্তু চারদিকের আবেষ্টনে, প্রকাণ্ড ঘরখানিতে, সেকেলে ধরনের ঝাড়লণ্ঠনের বাতির মধুর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোতে, দেয়ালের পর্দ্দাতে, ছবিতে, আর মেঝের ওপর পাতা বিছানাতে, নিমন্ত্রিতা মেয়েদের বসন-ভূষণের ও লাবণ্য-রূপের মাঝে কনে-শোভিত কন্যাসনখানি যেন পুরাণের কোন্ রাজকন্যাকে মনে পড়িয়ে দেয়।

অবশ্য আজ নতুন নয়। অনেক বিয়ে হয়েছে এ বাড়িতে। ঐ আসনখানিও বউভাতে বধূর আসন, কন্যার বিয়েতে মেয়ের আসন, বরাসন জামাইয়ের জন্য, অনেক বার হয়েছে।

এ সবই নরনারায়ণ ভাদুড়ীর পিতামহের আমলের জিনিস। তিনিই ছিলেন অতিশয় শৌখিন ও সূক্ষ্মরসজ্ঞ। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে ছিলেন, নাম ছিল ভুবনেশ্বরী। তাঁর বিয়ের সময়েই এই চৌকিখানি কেনা হয়। সে অনেক বছর আগের কথা, অর্থাৎ তিনি থাকলে তাঁর বয়স হ'ত একশো বারোর কম নয়। তার পরে তাঁর ভাইঝি অর্থাৎ নরনারায়ণের বোনদের বিয়েতেও ব্যবহার হয়েছে। ওঁরা ছিলেন তিনজন। দুজন নেই, একজন কোথায় কোন্ তীর্থে বাস করেন, কদাচ কখনও আসেন।

তাঁদের বড়র নাম রাজমোহিনী, মেজ ব্রজমোহিনী, সব ছোটর নাম মুনিমনোমোহিনী। এই বৃদ্ধা মুনিমনোমোহিনী বেঁচে আছেন। যৌবনে নাকি তাঁর রূপের কথাটা 'ডাকের কথা'র মত চলিত ছিল। বড় সুন্দরী ছিলেন। একদিন নাকি তিনি ঐ আসনে বসলে আসনের রূপ যত বেড়েছিল, আর কোনও রাজকন্যার বেলা তা হয় নি—নিন্দুক লোকে বলে। যেন আর সুন্দরী মেয়ে ছিল না বাড়িতে।

সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত্রি বাড়তে লাগল। নিমন্ত্রিতার সমাগমে বাড়ি ভ'রে যেতে লাগল। শিখাও সুন্দরী। ছবির মত সে চৌকিখানিতে ব'সে ছিল।

দলের পর দল আসে, যায়, খেয়ে এসে বসে, নয় বাড়ি ফেরে। জনতা ঘরে আর তেমন নেই। শুধু শিখার সমবয়সী কয়েকটি মেয়ে আছে।

সিঁড়িতে একখানি মুখ দেখা গেল। সে মুখ মুনিমনোমোহিনীর মত সুন্দর নয়—লোকে বলে। কিন্তু সে মুখখানির অধিকারিণীও কম আকর্ষণ করে না চোখকে।

শিখা হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল, বললে, পিসীমা। এগিয়ে এসে প্রণাম করলে। তোমার এত দেরি?

পিসীমা ভাইঝিকে বুকের কাছে নিয়ে কপালে মুখ ঠেকিয়ে বললেন, শরীর ভাল ছিল না রাণুমা।

এই পিসীমা ইন্দ্রাণী হচ্ছেন সুরনারায়ণদের বোন। এঁকে সুন্দরী বললে সব বলা হয় না, প্রতিমা বললেও ঠিক বলা হয় না, রূপেও তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ অনেক মেয়েকে হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু ইন্দ্রাণী যেন ইন্দ্রাণীই।

ওঁদের বংশে মেয়েদের নাম যেমন জমকালো রাখার প্রথা ছিল, আদরও তেমনই জমকালো হ'ত। অর্থাৎ আড়ম্বর ছাড়া কর্তারা এক

পা চলতেন না। তাই শুধু 'ইন্দু' নামে চলে নি, ইন্দ্রাণী রাখতে হয়েছিল, এবং জামাইকে নিমন্ত্রণে আদর করা হয় নি, ঘরে রেখে আদর দেখানো হয়েছিল।

ইন্দ্রাণীর পরিধানে লাল কস্তাপাড় শাড়ি। বড় কপালখানি ঘিরে পড়েছে সেই পাড়ের কিনার, সাদা শেমিজ গায়ে। কপালে সিন্দুর-ফোঁটা নেই, মাথায় বড় ক'রে সিঁদুর। হাতে গাছ কতক গোখরী চুড়ি, গলায় দড়াহার—পুরানো দড়ির মতনই মলিন। শরীর অত্যন্ত লঘু মনে হয়—মোটা নয়, পাতলা। বয়স হবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। কিন্তু কি জানি কেন, রূপের, মাধুরীর আর শ্রীর যেন শেষ ছিল না। তাঁর শান্ত সুন্দর নিরাড়ম্বর দীপ্তির কাছে তরুণী শিখাও যেন ম্লান।

মারা কোথায় রাণু?—পিসীমা প্রশ্ন করলেন।

রাণী ওরফে শিখা বললে, ঠিক জানি না। সমবয়সী মেয়ে কটি পিসীমার দিকে চেয়ে ছিল।

ভাজেদের ও মাকে খুঁজতে ইন্দ্রাণী অন্য মহলে গেলেন। ভাজেরা বললেন, এত দেরি?

তিনি মায়ের সন্ধানে গেলেন।

মা সন্ধ্যা করছিলেন। ইন্দ্রাণীকে দেখে, তাঁর জপের সংখ্যা শেষ ক'রে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বললেন, ইন্দু, এত দেরি? ইন্দু শুক্লা পঞ্চমীর ইন্দুলেখার মতন ম্লানভাবে একটু হাসলেন। তাঁর দেরি আর হাসির অর্থ মা জানতেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, রাণুকে দেওয়ার মত কিছু ঠিক হ'ল?

ইন্দুর চোখ নীচু হয়ে এল, বললেন, না মা।

মা চুপ ক'রে রইলেন খানিক।

তোর নিজের কিছু নেই ?—আবার মা প্রশ্ন করলেন।

মেয়ে বললেন, কই !

অন্যমনে দুজনের চোখই ঘরের লোহার সিন্দুকের ওপর পড়ল। ইন্দ্রাণীর সমস্ত গহনাই প্রায় ঐ সিন্দুকে ফিরে এসে জমা হয়েছে। একদিন ঐ সিন্দুক থেকেই ওঁর গায়ে তারা উঠেছিল।

তার ইতিহাস অনেক। কত দিনের কথা। রাজকন্যার বাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতা ক'রে রাজকন্যার অর্থাৎ ইন্দ্রাণীর শ্বশুরের অবিবেচনার ব্যয়জনিত ঋণ ; কিশোর স্বামীর ধনী শ্বশুরালয়ের আওতায় শ্বশুরশাশুড়ীর অত্যধিক প্রশ্রয়ে দায়িত্বহীন লালন ; ইন্দ্রাণীর শ্বশুরের মৃত্যু ; সেই তখন ঋণের পরিমাণ জানা ; তারপর সংসারের দুঃখ ভাবনা অসুখ, ঋণ পরিশোধের ভাবনা, লোক-লৌকিকতা, ছোট খরচ, বড় খরচ, মান রাখার জন্য আভিজাত্যের নিখুঁত অভিনয়, ওই ওরাই—সিন্দুকে যারা আছে, তারাই ওঁকে সেই রাজকন্যার অভিনয় করতে সাহায্য করেছে।

ইন্দ্রাণীর তখন বাবা বেঁচে ছিলেন। বহুমূল্য অলঙ্কার বাইরে বিক্রি করতে দেন নি। নিজের জিনিস নিজেই কিনে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন ভালই, সময় ভাল হ'লে কিনে নিও। এখন মা আছেন। মাও সেদিন খোকার অসুখের সময় শেষ মিনা ও মুক্তার সরস্বতী হারটি কিনে রেখেছেন, ঘরের জিনিস ঘরে থাক। ইন্দুর কপালে নেই, কি করবেন মা বাপ !

ইন্দ্রাণী চুপিচুপি রাত্রে এসে একে একে কত জিনিস বিক্রি ক'রে গেছে। ভাই ভাজ—সবাই জানে অবশ্য, অবশ্য জানে নাই যেন।

মা এবার বললেন, কানের ঝুমকো-লতাটা ?

না মা, নেই।

সেটা আবার কি হ'ল ?—আশ্চর্য্য হয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন।

ভাসুরঝিকে বিয়েতে দিয়েছে সেদিন।

মা উষ্ণভাবে চুপ ক'রে রইলেন। জামাই ? জামাইয়ের কি নিজের ভাইঝিকেও একটা কিছু দেওয়ার সঙ্গতি নেই ? সেও ইন্দুর জিনিস নিয়ে দিতে হবে ? মুখে কিছু বললেন না।

ইন্দ্রাণী চোখ না তুলেই সব দেখতে বুঝতে পারছিলেন যেন। কিন্তু তিনি জানেন, আজও তাঁকে সেই রাজকন্যারই অভিনয় করতে হবে, আর এও জানেন, নিখুঁত ক'রে। সেই অভিনয়ের ত্রুটি হয় পাছে, তাই মার এত ভাবনা, ভয়, এত জিজ্ঞাসা।

আর ইন্দ্রাণীর সব মনে আছে, আঠারো বছরের ছেলে—জামাইকে ছেলের চেয়ে আদরে ঘরে রাখা, মেয়েকে নিজের ঘরে না দিয়ে কাছে রাখা, মাতার ও পিতার ইন্দ্রাণীগত প্রাণের কথা এবং তার জন্য ভাইদের ওঁদের দুজনের প্রতি বিরাগের কথা—সমস্ত মনে আছে। পরকে আপন করার জন্য যে অতিরিক্ত আদরের প্রশ্রয়ের উৎকোচ দেওয়া মানুষের স্বভাব আছে, তার কাজ আদায়ের প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে, তাই আজ সেই তাঁর অর্থহীন সহায়-সম্পদহীন অস্তিত্বের ওপর আর কারুর শ্রদ্ধা নেই।

শ্রান্তভাবে ইন্দ্রাণীর মনে হতে লাগল, ঐ সিন্দুক থেকে একটি—একটি মাত্র ওঁরই গহনা আজকের মত আবার ওঁর হয়ে যেত! রাণুকে দেওয়া যেত। তারপর ? তারপর আবার যেমন দেউলে নিঃস্ব আছেন, তাই থাকতো। শুধু রাণুকে দেওয়াই ওঁর ভাবনা।

দুজনেই চুপ ক'রে রইলেন।

অনেক পরে মা বললেন, তবে ?

ইন্দ্রাণী কিছু জবাব দেবার আগেই ঘরে মুনিমনোমোহিনী এসে দাঁড়ালেন।

ওমা, ঠাকুরঝি যে! এস, এস।—ইন্দ্রাণীর মা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনায় আহ্বান করলেন।

এই আসছি কাশী থেকে, লোক গিয়েছিল তোমার।

ইন্দ্রাণী পিসীমায়ের পায়ের ধূলো নিলেন।

বয়স তাঁর সত্তরের কাছে। সুশ্রী, একটু দীর্ঘাকৃতি, পাতলা চেহারা। সুন্দরী ছিলেন মনে হয়।

আস্তে আস্তে বাড়ির অন্য সকলে মায়ের ঘরে এসে পিসীমায়ের কাছে জমা হ'ল।

ইন্দ্রাণী আর তাঁর ভাবনা বিয়ে-বাড়ির উৎসবে আর গোলমালে থমকে গেল।

অনেক রাত্রে ক্লান্তশরীরে ক্লান্তমনে ভাবনায় ভয়ে তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন অভুক্ত অসুস্থ শরীরে।

বিয়ের দিন। গায়ে হলুদের উৎসব ছাড়িয়ে গেছে।

দোতলার ঘরে জ্যেঠীমা পরাচ্ছিলেন রাণুকে চন্দন, মা কাপড়-চোপড় গহনা ঠিক করছিলেন পরাবার জন্য।

রাণু অর্থাৎ শিখার জ্যেঠীমা সেকেলে ধরনের জমিদারের ঘরের মেয়ে। পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন, একটু সাদাসিদে, এখনও স্বজনকে সমীহ করেন, গুরুজনকে ভয় করেন, অন্যায় সত্য স্পষ্ট বলতে পারেন না, লজ্জা পান বলতে, দেখতে সুশ্রী।

রাণুর মা খুব সুন্দরী। শহরের গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে। শুধু রূপের জোরেই যে এ বাড়িতে এসেছেন, তা উনি জানেন আর সকলেও

জানে; এবং সেই রূপকে রৌপ্যের আভিজাত্যের গৌরব যে কেউ দিতে চায় না, এ কথাও উনি জানেন। এ দুঃখ তাঁর যায় না। তাই তিনি ঘরে পরে সর্ব্বত্র অপরের রূপের খুঁত ধরেন, অভিজাত-ঘরের জন্যে রূপের ও রঙের মহিমা যে অন্য অনেক কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাই প্রতিপন্ন করবার জন্যে অনেক স্পষ্ট কথা, হক কথা বলেন, এবং তাঁর এক অবাস্তব মাতুলবংশের পরলোকগত আভিজাত্যের গর্ব্ব ক'রে থাকেন।

রাণুর মা বললেন, দেখলে দিদি, ঠাকুরঝির কাণ্ড! কাল অত রাত্রিতে এলেন, ভাল ক'রে খেলেন না, এত বা অসুখ কি!

ওঁর যেন অন্তঃকরণটা কেমনতর!—ছোট বউ কিছু বিশুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করতে ভালবাসেন। ছোটবেলা কোন্ মিশন স্কুলে প'ড়ে তিনি 'গুড কণ্ডাক্টে'র মেডেল পেয়েছিলেন।

জ্যেঠীমা চন্দন বেঁকে যাবার ভয়ে খুব আস্তে আস্তে উত্তর দিলেন, হবে, অসুখ করেছে হয়তো বা।

রাণু বললে, হ্যাঁ, পিসীমার গা গরম ছিল আমি দেখেছি।

রাণুর মা বললেন, কি দিলেন তোকে তোর পিসী? জান দিদি, এখনও ঐ ভয়েই আসে নি। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, দিয়ে নিয়ে একটাই ভাইঝি তো! এই তো আমি সেদিন আমার ভাইঝিকে মুক্তোর কলার দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলুম। মনের সে টান থাকলে তো!

জ্যেঠীমা চন্দনের সূক্ষ্ম ফুল আঁকছিলেন মেয়ের গালে, বেঁকে যাবার ভয়ে রেখা টানার মতই আস্তে আস্তে বললেন, আজ মার সিন্দুক খুলেছিলাম রাণুর বরের দৃষ্টিভাতের রূপোর বাসনের জন্যে। জানিস, ঠাকুরঝির সব গয়না ঐ সিন্দুকে।

ছোট জা বললেন, মানে? মার কাছে রেখে গেছেন?

অনেকটা। জন্মের মত রেখে গেছেন। ওর সবই মা নিলেন শুনেছিলাম যেন।

ছোট বউ সবিস্ময়ে বললেন, এমন পোড়া কপাল! হ্যাঁ ভাই, হাই আমলা কে বাটবে? উনি?

দরজার পাশে ছায়া পড়ল, ঘরের বড় আরশিতে সেই ছায়াধিকারিণীকে নিমেষের জন্য দেখা গেল। দেখতে দেখতে সেই ছায়া বারান্দা পার হয়ে গেল।

জ্যেঠীমা জবাবে তখন বলছিলেন, না, ও কেন করবে? ও তো অন্য সম্পর্কের কাজ।

রাণু বললে, পিসীমা।

জ্যেঠীমা ও রাণুর মা নীচু মুখে ছিলেন, দেখতে পান নি। বললেন, কই?

মেয়ে বললে, দেখলাম যেন সেই রকম।

বধূরা সভয়ে চুপ ক'রে গেলেন।

বাইরের সিঁড়ির মোড় যেখানে বেঁকে তিনতলায় উঠে গেছে, সেখান থেকে নীচের প্রাঙ্গণের বরসভা দেখা যায়।

বাইরের সিঁড়ি, মেয়েদের ভিড় সেখানে নেই। ছেলেরাও নীচেই।

ইন্দ্রাণী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেলিঙের গায়ে ভর দিয়ে।

আলোতে উৎসবে ঝলমলে প্রাসাদের মত বাড়ি।

ইন্দ্রাণী ঝুঁকে নীচে বরসভা দেখতে লাগলেন। সেই চৌকিখানি, সেই একই ধরনের সাঁচ্চা সলমা-জরির কাজ করা গদি তাকিয়া। একই রকম সব। হয়তো একদিন মুনিমনোমোহিনীর বরও ওই বরাসনেই ঐরকম ভাবে বসেছিলেন। সেদিন পিসীমাকেও ঐরকম সাজানো হয়েছিল।

স্বপ্নের মত এলোমেলোভাবে ইন্দ্রাণীর কত কথা মনে হচ্ছিল। ভাজেদের কথা? হ্যাঁ, কিছু কানে গেছে। কিন্তু তাতে কি? ইন্দ্রাণীর শুধু মনে হতে লাগল, সে যদি সব ভুলে যায়!

তবু মনের ছোট্ট কোণের একটুখানি জায়গায় ঘুরে ফিরে জাগে, কালকে রাণুকে কিছু একটা দেওয়া দরকার। আচ্ছা, সে তো আজ নয়, কাল। কিন্তু কি—কি দেবেন?

চুপ ক'রে নীচের দিকে চেয়ে থাকেন।

হঠাৎ তাঁর কি রকম হাসি এল। হাসতে গিয়ে কিন্তু চোখ ভ'রে জল এল।

চারদিকের বাগানের ঘুমন্ত গাছের রাত্রে-ফোটা ফুলের গন্ধে বাইরের অন্ধকার, ভেতরের উৎসব মদিরভাবে ভ'রে উঠেছে যেন। তাই কি? তাইতেই হয়তো ওঁর মাথা ধরেছে মনে হ'ল। হাসি এল না। অন্যমনে ভাবতে চেষ্টা করলেন, কি ফুটেছে? বকুল? রজনীগন্ধা? বেল? না, যেন বোশেখী চাঁপা। মিষ্টি উগ্র মিশ্র গন্ধে, ভাবনায়, অবসাদে, মাথাধরায় ওঁর শরীর মন যেন ভেঙে পড়ছিল শিথিল হয়ে।

মনে হচ্ছিল, কোন একখানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন—অনেকক্ষণ অনেকদিন—সেই গল্পের কাঁটাবনের মাঝে রাজকন্যার মত—চিরদিন—আর ঘুম না ভাঙে!

কাল তা হ'লে আর রাণুদের আশীর্ব্বাদ করতে হয় না। মনে হতে লাগল, বয়সের ওঁর সীমা নেই, অনেক। দিনগুলো কি এখন রূপান্তরিত হয়ে বছর হয়ে উঠেছে!

হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ হ'ল।

বড় ভাই আসছিলেন বধূদের নিয়ে, বরসভা দেখাবার জন্যে।

কি রে, এখানে কে? ইন্দু? ভাল আছিস? কাল এসেছিলি?

দেখি নি তো! তোর মেয়ে ছেলে কই? কেমন বরসভা হয়েছে? তোর মুখটা অমন শুকনো কেন? জ্বর হয়েছে? ও! ওগো, ওর বাড়িতে তা হ'লে ভাল ক'রে খাবার-দাবার যায় যেন, দেখো। কেমন সভা সাজানো দেখছিস? বেশ, না?

ভাইয়ের ঝড়ের মত প্রশ্ন ও কথায় ইন্দ্রাণী জবাব দেবার সময় না পেয়ে ঘাড় নেড়ে শুধু একটু হাসলেন।

ভাই চ'লে গেলেন। চুল-বাঁধার সময়ের কথা শুনতে পাওয়ার সন্দেহ ছিল, অপ্রস্তুত মিষ্টি স্বরে ভাজেরা বললেন, তুমি এখানে একলা কেন ভাই?

বর আসবে, তাই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

চল, রাণুর কাছে যাই। সাজানো দেখেছ?

না, চল।

কনেচন্দনপরা রাণু পিঁড়িতে ব'সে জল সওয়ার জলে হাত ডুবিয়ে ব'সে ছিল। বর আসবার আর দেরি নেই, আগে থাকতেই তাই রাণুকে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

জ্যেঠীমা, মা আর পিসীমা এসে দাঁড়ালেন।

ঠাকুরঝি, রাণুর সব গয়না দেখেছ?—মেয়ের মা জিজ্ঞাসা করলেন।

ইন্দ্রাণী বললেন, সব বোধ হয় দেখি নি।

গায়ে তার গহনার সীমা পরিসীমা নেই। মা, জ্যেঠীমা, ঠাকুমার শখে তৈরি করানো, পৃথক পৃথক আশীর্ব্বাদের জন্যে গড়ানো, বাপের আদরে সাজানো, মাতামহী মাসী মামীদের যৌতুকের দেওয়া। না, ওর গায়েও ধরে নি সব, আর সংখ্যাও যেন নেই। ইন্দ্রাণীর নিজের দু-একটা কি জিনিসও রয়েছে তার মধ্যে। জিনিস ইন্দ্রাণীর বটে, কিন্তু সে তো

দেয় নি! চট ক'রে চারজনেরই যেন একসঙ্গে মনে পড়ল, এই আত্মীয়-তালিকার উপহারের পাশে ইন্দ্রাণীর নাম নেই। ইন্দ্রাণীর তাই মনে হ'ল অন্তত, ওদের মনে পড়ুক বা না পড়ুক।

বড় ভাজ বললেন, কাশীর ছোট পিসীমা রাণুকে এই দুটি মাথার কাঁটা দিয়েছেন।

ছোট ভাজ একটু হেসে ফেলে বললেন, যেন পেতলের মত রং, না দিদি? দেবার যখন ক্ষমতা নেই, নাই বা দিতেন বাবু।

ইন্দুর পক্ষে ঘরের হাওয়াটা যেন একটু ভারী হয়ে উঠল।

ছোট ভাজ বললেন, জান ভাই, আজ কি কাণ্ড হয়েছে? পিসীমার ঝি নাকি দুদিন ধ'রে আমাদের সেই গোলাপমধু আমের গাছের আম নিয়ে আসছিল, কারুকে না জিজ্ঞেস ক'রেই। এখন মালী রাখে গুনে কিনা, কাজেই কম পড়েছে তার। আজকে যেমন নেওয়া, সে আম কটি নিয়েছে হাত থেকে। তখন সে বলেছে, পিসীমা ব'লে দিয়েছেন তাঁর বাবার পোঁতা গাছ থেকে আনতে। তারপর আম আর নেয় নি, গেল পিসীমার কাছে, আর মালী গেল বাইরে। আমরা কিছু জানি না। এঁরা আম দিয়েছেন পাঠিয়ে ভেতরে মার ঘরে। এদিকে পিসীমা নাকি ভারী লজ্জিত হয়েছেন, রাগও করেছেন একটু। কি সব কথা হয়েছে জানি না। তা এঁরা নাকি বলেছেন, নিজের সীমার মাঝে থাকলে তো কথা হয় না, সীমা রাখতে জানা চাই।

ইন্দ্রাণীকে যেন কে এক ঘা চাবুক মেরে গেল মনে হ'ল। সীমা? সীমা তার তা হ'লে কতটুকু? সে জানে তো রাখতে? নিজের গণ্ডির সীমানা সে মানে তো? অজান্তেই পিসী ভাইঝির চোখোচোখি হয়ে গেল। শিখাও বালিকা নয়, সতরো-আঠারো বছর বয়স হয়েছে, এখনকার মেয়ে। শিখার চোখ নীচু হয়ে গেল।

ইন্দ্রাণীও চুপ ক'রে ছাইয়ের মত মুখে চেয়ে রইলেন। কথা হয়ে যাবার পর হঠাৎ বধূদের মনে হ'ল, যেন কথাটা মজার নয়, না বলবার মতই কথা।

রাস্তার মোড়ে দূরে বিলিতী বাজনার একটা ঝঙ্কার জোরে বেজে উঠল। ঘরের আবহাওয়াটাও যেন নড়ে উঠল। রাণুর মা জ্যেঠীমা তাড়াতাড়ি সব বেরিয়ে গেলেন। বাইরের দালানে শুধু পায়ের পর পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

বর আসতে তখনও দেরি আছে। সকলে ভাল জায়গা নেবার জন্যে এগিয়ে গেছে।

ইন্দ্রাণী তখনও যান নি। রাণু সলজ্জ রাঙা মুখে পিসীমার দিকে চাইলে।

তার লজ্জা দেখে পিসীমা একটু হাসলেন, সাদা পাঙাশ তাঁর মুখে রক্ত ফিরে এল। এবারে সেও ফিক ক'রে হাসলে।

অনেক রাত্রে ইন্দ্রাণী ফিরলেন। বিবাহ, বাসর, বর নিয়ে উৎসব সমারোহ প্রথামত বা তার চেয়ে বেশি ক'রেও হয়ে যেতে লাগল।

ইন্দ্রাণীর বাড়ি ওদের বাড়ির কাছেই। গাড়ি ক'রে ঘোরাপথে যাওয়া-আসা যায়, হেঁটে বাগানের পথে যাওয়া চলে।

আসলে সেটা জমিদারদের অতিথিশালা ছিল। এখন অনেকদিন ধ'রে সেই অতিথিপালনের প্রথা নেই। এখন ওটা কাছারি-বাড়ি, নায়েব, গোমস্তা, কর্ম্মচারীদের বাসস্থান, আব নীচের তলাটা মোটর-গ্যারাজ, চাকরদের ঘর ইত্যাদি কাজে লাগে।

ইন্দ্রাণী যখন পৃথক হলেন বাপের মৃত্যুর পর, তারপরেই তাঁর

শ্বশুর-বাড়ির ঘোমটা-দেওয়া মানসম্ভ্রমের অসূর্য্যম্পশ্য রূপের অবগুণ্ঠন খুলে যেতে সদ্যবিধবার মত শ্রীহীন রিক্ত নিরৈশ্বর্য্য মূর্ত্তি দেখা গেল। সেদিন জামাই নিলেন কোথায় সামান্য দক্ষিণায় কি এক কাজ। আর ইন্দু খুঁজলেন সস্তা ভাড়ায় বাড়ি। সঙ্গে তাঁর নিজের দুটি ও ননদের তিন-চারটি মাতৃহীন ছেলেমেয়ে।

ভেবে-চিন্তে তিনি ঐ বাড়ি ভাড়া চেয়েছিলেন। আর ভাইয়েরা ও মা'ও ভেবে-চিন্তে অমনই থাকতে দিয়েছিলেন।

ইন্দু ভায়ের গাড়িতে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলেন। ড্রাইভারের পাশ থেকে চাকর নামল। তারপর একে একে ঝুড়ি, চেঙারি, থালা, ডালা নিয়ে ভেতরে আসতে লাগল।

ইন্দ্রাণী চুপ ক'রে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রকের ওপরে ইন্দ্রাণীর পায়ের কাছে আশেপাশে এদিকে ওদিকে যজ্ঞির রান্নায়, মিষ্টিতে, খাবারে, ফলে, ক্ষীরে, দইয়ে ভরা ঝুড়ি বাসন সাজানো হতে লাগল।

চাকর সব রেখে প্রণাম ক'রে বললে, এবারে আমি যাই ?

উদাসীন নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তিনি সেই দিকে চেয়ে ছিলেন, বললেন, হ্যাঁ, তুমি যাও। বাসন আমি পাঠিয়ে দোব।

ইন্দ্রাণী চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন। হ্যাঁ, সব জিনিস এসেছে—অনেক, প্রচুর। ওঁরা জানেন, মা বউদিরা দাদারা সব দিতে জানেন। ইন্দ্রাণীর ঠোঁটের কোণে কেমন একটা ক্ষীণ অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটে উঠল। হ্যাঁ, ওঁরা সকলে জানেন, এরা এই সব ভাল জিনিস দু দিন তিন দিন ধ'রে খাবে।

মা হয়তো কাল আবার কিছু পাঠাবেন। দাদারা হয়তো জিজ্ঞাসা

করবেন, ইন্দুর বাড়ি খাবার কতখানি গেছে? এবং হয়তো বলবেন, কত লোকজন খেয়ে যাচ্ছে, কত ফেলা-ছড়া হচ্ছে, চাকরবাকররা খাচ্ছে, আর ইন্দুর বাড়ি তোমরা আরও দাও নি কেন? আবার বউদিরা পাঠাবেন।

বাইরে গাড়ি বেরিয়ে গেল, শব্দ হ'ল।

রাত্রি কত ইন্দুর খেয়াল নেই। জ্বরের ঘোরে, দুর্ব্বল ক্লান্ত দেহে, চোখ বুজে ওঁর মনে হতে লাগল, ওগুলো শুধুই খাবার নয়, ওগুলো যেন সব ওঁর বাপের বাড়ির চাকর দাসী আত্মীয় স্বজনের গর্ব্বিত মুখ—ওঁর দিকে সহাস্য গর্ব্বে চেয়ে আছে। যেন বলছে, তোল, তোল এই সব, এইগুলো ঘরে তোল, কাল তোমার ছেলেদের, স্বামীকে, পরিজনদের দিও, কদিন ধ'রে দিও।

তিনি চোখ খুললেন না, সভয়ে চোখ বুজেই রইলেন, মুখে এল, চাই না, এ আমার চাই না, ফিরিয়ে নিক, ফিরিয়ে নিক।

ভেতর থেকে মেয়ে ডাকলে, মা!

চটকা ভাঙল, মা বললেন, যাই।

মেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। চাঙারিগুলো তখন ছোট নিরীহ হয়ে গেছে আবার—খাবারে ভরা।

মা বললেন, তোল তো মা তোরা এইগুলো। আমি আর পারছি না।

* * *

বর-কন্যা বিদায়ের লগ্ন পড়ল বিকালে।

ইন্দ্রাণীর জ্বর কমে নি। বরং দুর্ব্বলতা বেড়েছিল। আর ভাবনার তো সীমা ছিলই না। বিকালবেলা রাণু এল বিদায় নিতে। চঞ্চলা অগ্নিশিখার মত রক্তাম্বরা, ঈষৎ শুষ্ক অথচ দীপ্ত সলজ্জ মুখে নববিবাহিতা শিখা পিসীমার কাছে এসে দাঁড়াল।

কেমন আছ পিসীমা? গেলে না তো? ওমা, এখনও জ্বর আছে?— মাথায় হাত রাখলে রাণু।

পিসীমা ওকে দেখে আনন্দে এবং না-যাওয়া এবং কিছু-না-দেওয়ার লজ্জায় সজল চোখে উঠে বসলেন, বললেন, আয়।

শোও তুমি।—ব'লে রাণু পাশে বসল।

ইন্দ্রাণী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নিজের গলা থেকে সেই পুরোনো দড়ির মত হারটি খুলে অপ্রস্তুতভাবে বললেন, তোকে তো কিছুই দেওয়া হ'ল না আমার। তা তুই এইটে ভেঙে একছড়া ছোট হার গড়িয়ে নিস, কেমন? আমার আর মনের মতন কিছু দেওয়া হ'ল না।

ইন্দ্রাণীর চোখ দুটি ঠোঁট দুটি যেন, রাণুর মনে হ'ল, অনেক দুঃখের কাহিনী লুকিয়ে রেখেছে।

খানিক আগেই রাণু ঠাকুমার ঘরের সিন্দুক থেকে সব গহনা পরতে ব'সে ছিল। একটি একটি ক'রে কতগুলি ছোট বড় মাঝারি গহনার কেস দেখলে; গহনা দেখলে তার মধ্যের; শুনলে, পিসীমার সব। গত কালকের মার জ্যেঠীমার কথার ধরন, ইন্দ্রাণীর সঙ্কোচ, বাপের সাধারণ ব্যবহার ওর মনে কি এক ঐক্যের ভাবে সঙ্গোপন সমবেদনা সৃষ্টি করে-ছিল, ওর নিজেরই জানা নেই—কেন।

পিসীমার কথায় এখন স্পষ্ট বুঝলে মায়ের কালকের কথা।

তাঁর কথায় ও হারটি হাতে ক'রে নিয়ে প'রে বললে, না, আমি পরব, দাও।

পিসীমা আরও অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আমি তোকে পরে গড়িয়ে দোব। তুই ওটা প'রে শ্বশুর-বাড়ি যাস নি।

রাণু হারটি প'রে উঠে দাঁড়াল, বললে, আমি পিসেমশাইকে প্রণাম ক'রে আসি।

ইন্দ্রাণী চুপ ক'রে ওর দিকে চেয়ে রইলেন। সে ঘর থেকে চ'লে গেল। বসনে ভূষণে রূপে শোভায় অপরূপ রাণু।

তাঁর বুকের কাছে গলার কাছে এলোমেলো অনেক কথা জড় হতে লাগল। তারা যেন সকলেই বলতে লাগল, ওরে, এই আদর সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। সত্যি নয়, সত্যি নয়। কোনখানে এর সত্যি কিছু নেই। সমস্ত ফাঁকা, শুধু খেলা।

কতক্ষণ ইন্দ্রাণী চোখ বুজে শুয়ে রইলেন।

রাণু ফিরে এসে বললে, পিসীমা, মাথাটা তোল, প্রণাম করি।

পিসীমা উঠে বসলেন, রাণুর কপালে চুম্বন ক'রে বললেন, সাবিত্রী হও, রাজরাণী হও, সর্ব্বসুখী হও।

কেন কে জানে, বারে বারে ঐ একই কথা মুখে আসতে লাগল। গলার কাছে সেই জড়-হওয়া জমা-হওয়া কথাগুলো ঠোঁটের কাছে আসতেই রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে মনে আসে, সর্ব্বসৌভাগ্যবতী হও, রাজলক্ষ্মী হও।

পিসীমা রাণুর মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে আবার আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করেন।

রাণুর চোখ ছলছল করতে লাগল। সে পিসীমার দেওয়া হারটা গলা·থেকে টেনে আঙুলে জড়াতে লাগল।

পিসীমা বললেন, ওটা ভেঙে গড়িয়ে নিস কিছু।

যাবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াল। মাথাটা কোন্ ভাগে নাড়লে, বোঝা গেল না।